বিনিময় : ১৫ টাকা

অধিকার

মার্চ ২০২৩

এই সংখ্যার বিষয়- নারী দিবস

- নারীর অধিকার : নারীর মানবাধিকার / পৃ.৩
- নারী - অধিকার (একটি কাল্পনিক কথোপকথন / পৃ. ৬
- নারী আন্দোলন অধিকার চেতনা কি বাস্তবে চেতনার সংঘাত? / পৃ.৭
- আম্মা (AMMA) : কর্মস্থল বা পরিবার কোনটাই আর আগের মত থাকবে না / পৃ.১২
- 'এ পরবাসে রবে কে!' / পৃ.১৩
- নারী দিবস নারী মুক্তি নারী প্রগতি / পৃ.১৬
- এপিডিআর-এর প্রাক্তন সম্পাদক দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য'র জীবনাবসান / পৃ.২
- সংগঠন সংবাদ / পৃ.১১
- রিপোর্ট / পৃ.১৯-২৫
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ.২৫-২৮

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যা নিবেদিত হল নারী দিবস এবং নারী অধিকারের সম্মানে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আদতে দিনটি ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস। ১৯০৮ সালে আমেরিকার দর্জি শ্রমিকদের আন্দোলন থেকে শুরু। ১৯০৯ এ এইদিনে শুধু দর্জি শ্রমিক নয় সমস্ত ক্ষেত্রের মহিলারাই পথে নামে। দাবি পুরুষের সমান মজুরি, কাজের সময় কমানো এবং ভোটাধিকার। ১৯১০ জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন এই দিনটিকে প্রতি বছর

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী (Working Women's Day) দিবস হিসাবে পালনের ডাক দেন। ইউনেস্কোও পরে দিনটিকে নারীদের নিজস্ব দিন হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু মাঝের শ্রমজীবী কথাটা বাদ দিয়ে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

নিছক কোনো দিবস পালন নয়, বিজ্ঞাপনের বিশেষ ছাড় অথবা একদিন মেয়েদের একটু খাতির যত্নও নয়। আসলে নারী দিবসের ডাক ছিল মেয়েদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ডাক। একশো বছর পার করে এসে এই ডাক আজও গুরুত্ব হারায়নি। বরং আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আজকের সমাজেও বৈষম্য রয়েছে বহাল তবিয়তে। দুনিয়া জুড়েই। যেকোনো বৈষম্যের ভিত্তিই হল ক্ষমতা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মেয়েদের হাতে এই ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমানাধিকার বলতে সমাজের সকল স্তরে— সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারকেই বোঝায়। সংবিধানের খাতায় কলমে কিছু সমতার উল্লেখ থাকলেও, মহিলাদের ওপর নির্যাতন বিরোধী আইন থাকলেও, আসলে প্রয়োগ কর্তারা যেহেতু এই ব্যবস্থারই পালকপিতা তাই নিস্তার মেলেনি। এই একশো বছর পেরিয়ে জাতীয় স্তরে একজন মহিলা শ্রমিকের মজুরি গড়ে একজন পুরুষের মজুরির ৭৮ শতাংশ হলেও দেখা যাচ্ছে রাজ্যভেদে এই বৈষম্য আরও বেশি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যে মহিলা কর্মীরা গড়ে পুরুষের তুলনায় দৈনিক ১০৫ টাকা (শহরাঞ্চলে) ও ১২৩ টাকা (গ্রামাঞ্চলে) কম পান। ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে একজন মহিলা শ্রমিকের দৈনিক ৭২ টাকা (শহরাঞ্চলে) ও ৪৭ টাকা

(গ্রামাঞ্চলে) কম পান। সংগঠিত ক্ষেত্রেও পদে পদে বৈষম্যের জাল এমনভাবে ছড়ানো থাকে বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না। ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানে। যদিও দেশে সমানাধিকার ও সমবেতন আইন বলবৎ আছে। কিন্তু তা পারেনি এই বৈষম্য দূর করতে। আর রাজনৈতিক অধিকার? গ্রাম বাংলায় এসব কথা মুখে আনাও নিষিদ্ধ প্রায়। যেখানে মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানের চেয়ারে আসীন রয়েছেন তার পুরুষ সঙ্গীটি। কেউ যদি ভুল করে প্রধানের সাথে দেখা করতে চান, চেয়ারে থাকা ব্যক্তিটি তখনই বলে ওঠেন, ''ও মেয়েমানুষ। ও কী বুঝবে এসবের?'' মোদ্দা কথা হল ঐ চেয়ারের ক্ষমতা তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ছাড়তে রাজি নন, মোটেও। ক্ষমতা থাকলে তা হারানোর ভয়ও থাকে অনেক। তাই, যে বাংলার মেয়েরা স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক এন আর সি বিরোধী আন্দোলনে কোমরে আঁচল বেঁধে লড়ে গেছেন-যাচ্ছেন, তাদের ক্ষমতাকে পিতৃতান্ত্রিকতা ভয় পায়। ভয় পায় বলেই অবদমন করে।

তাহলে কী বলতে হয়, আজকের মেয়েরা এক পা-ও এগোতে পারেননি? অসম বিকাশের দেশে এই প্রশ্নের হ্যাঁ বা না-তে উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কারণ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিন্যাসে পরিবর্তনের কারণে বৈষম্যও ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে সমাজের মধ্যে। বৈষম্যের রূপ বদলিয়েছে। কিন্তু বৈষম্যহীন সমাজ আজও গড়ে ওঠেনি। 'অর্ধেক আকাশ' এর অঙ্গীকার করে যে সমাজের আইন কানুন, সংবিধান, সেই একই সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পুরুষেরা সীমানা টানতে চান আকাশেরও। এই দিনে বাণিজ্যিক ছাড়ের বিজ্ঞাপনে ঝলসে ওঠে যে নারীদিবস তা বৈষম্যকে আঙ্গুল দিয়ে চেনায় না আমাদের। 'অর্ধেক আকাশ' যে আসলে বাণিজ্যের নয়, বরং তা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাটা থেকে মুক্তির পরিসর তা আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়। সমানাধিকার যে আসলে প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার তা' আমাদের শেখানো হয় না। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে এই লড়াই শুধু নারীদের নয়। ৮ই মার্চ সেকথাও স্মরণ করা ও করিয়ে দেওয়ার দিনও।

এপিডিআর-এর প্রাক্তন সম্পাদক দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য'র জীবনাবসান

''মরণ বলে, আমি তোমার জীবন তরী বাই''— চলে গেলেন দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য না-ফেরার দেশে। রবিবার ভোর ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩-এ কলকাতার রাসবিহারী এলাকায় নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে লিউকোমিয়ায় ভুগছিলেন। এস এস কে এম হাসপাতালে তাঁর দেহ দান করা হয়। রেখে গেলেন স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ ও নাতিকে।

যুবক দেবাশীষ ভট্টাচার্য ছিলেন বামপন্থী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। নকশাল পন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক কারণে সিদ্ধার্থ শংকর রায়-এর জমানায় নিবর্তনমূলক আটক আইনে কারাবাসও করতে হয়েছে। একাধারে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক ও সর্বোপরি নাগরিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্ব ছিলেন তিনি।

দেবাশীষ ভট্টাচার্য তাঁর সাংবাদিকতার জীবন শুরু করেন, 'দর্পণ' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন 'আজকাল' পত্রিকায়। দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলও কাজ করেছেন। তাঁর লেখা 'সত্তরের দিনগুলি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। এক রক্তাক্ত ও বেদনাবিদ্ধ, ভয়ংকর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সময়ে এ পি ডি আর-এর জন্ম হয়। কতিপয় বুদ্ধিজীবি ও কিছু র‍্যাডিক্যল যুবকদের নিয়ে গড়ে ওঠে এই সংগঠনে। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ও তাঁর কাজকে সারা বাংলায় পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে দেবাশীষ ভট্টাচার্য্যের অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

তাঁর আমলে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের কাজ হয় ও তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যা'র মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিহারের সামন্ত প্রভুদের প্রাইভেট আর্মির দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড গুলি। ১৯৮৬ সালে বিহারে আরওয়ালের গান্ধী ময়দানে গরিব ক্ষেতমজুরদের মিটিং-এ পুলিশ ২১ জনকে হত্যা করে। নেতৃত্বে ছিলেন তদানীন্তন এসপি পাশওয়ান। দুটি তদন্ত হয়েছিল (রাজস্ব সদস্য বিনোদ কুমারের নেতৃত্বে ও অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সিডিউল কাস্ট ও সিডিউল ট্রাইব বিডি শর্মার নেতৃত্বে)কিন্তু তার রির্পোট প্রকাশিত হয়নি।

ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার ট্রাইবুনাল থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে দেশের বিভিন্ন নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি ২৩ মার্চ, ১৯৮৬-তে 'জনগণের ট্রাইবুনাল' শীর্ষক ভাবনাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, এক্ষেত্রেও এপিডিআরএর দেবাশীষ ভট্টাচার্য্যদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক তার স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। বিদায়, প্রিয় দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য।

নারীর অধিকার : নারীর মানবাধিকার

সুরঞ্জন প্রামাণিক

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস, তার প্রায় তিন মাস আগে ১০ই ডিসেম্বর পালিত হয় বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। ওই দিবস পালনের তিন মাস পরে আজও কেন পৃথকভাবে নারী দিবস পালন করতে হয়? নারী বলে কি তাঁরা 'মানব পরিবার'-এর সদস্য নন? এ রকম প্রশ্ন অনেকের কাছেই তেমন মেধাবী মনে নাও হতে পারে বা অস্বস্তিকর মনে হওয়াও স্বাভাবিক। যা-ই ভাবি না কেন, একে কিন্তু উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। বিশেষ করে এই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের (বুর্জোয়া বিপ্লবের) চলমানতায়, এই সময়ে নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে অবস্থান করছে। এটা মনে রেখে আমরা প্রথমে নারীদিবসের প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করব।

মানবপ্রকৃতি থেকে নারীপ্রকৃতির বিচ্ছিন্নকরণ

জৈবিক সত্তা হিসাবে নারী-পুরুষ পরস্পরের বিপরীত ও পরিপূরক সত্তা। কিন্তু মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোনও প্রাকৃতিক কারণ সামাজিক পরিসরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তা'- থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল 'নারীপ্রকৃতি'কে শৃঙ্খলিত করা বা তার উপর দমন-পীড়ন নামানো। এই দমন-পীড়ন থেকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ (>রাষ্ট্র)-এর উৎপত্তি ও তার উৎপাদন সম্পর্কের চলমানতা— এ রকম অনুমান করা যেতে পারে, অন্তত হেনরি মর্গান, মার্ক্স-এঙ্গেলসের সাপোর্ট কম-বেশি পাওয়া যাবে এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তথা বুর্জোয়া সমাজ আজও বিকাশমান।

মনে রাখতে হবে দমন-পীড়নের প্রতিক্রিয়া (দ্বন্দ্বের নিয়ম) যা থেকে আজও সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে ভাঙাগড়া অব্যাহত রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয়, দাস-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যে প্রভু-অধীন সম্পর্কে সমাজ চলমান ছিল, অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থাও (সামন্ত, বুর্জোয়া) সেই সম্পর্ক থেকে মুক্ত হতে পারেনি বরং তার-ই 'পরিশীলিত' রূপ বজায় রেখেছে। অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় চলমান বুর্জোয়া বিপ্লব সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে প্রভু-অধীন সম্পর্কের নতুন নতুন রূপও সৃষ্টি হচ্ছে।

বুর্জোয়া বিপ্লবে নারীর ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাস নারীর মর্যাদা দেয়নি। আমরা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারব, ১৭৮৯-এর 'ফরাসী বিপ্লব'-এর কথা। ইতিহাসে এটাই প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব কিন্তু ফ্রান্সের বুর্জোয়া 'সংবিধান সভা' মানুষের যে অধিকার ঘোষণা করে (১৭৮৯) তা'তে মানুষ হিসাবে নারীর কোনও অধিকার ছিল না। ঘোষণার ইংরেজি তর্জমায় তা' স্পষ্ট হয়ে আছে Declaration of the Right of Men and Citizen।

এই অনুষঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বুর্জোয়া বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লবও সংঘটিত হয়েছিল ফ্রান্সে, ১৮৭১ সালে, (আমরা প্যারী কমিউনের কথা বলছি), সেখানেও নারীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ভূমিকা ছিল।

প্রকৃতির অধিকার না-থাকা নারীর 'দিবস'-আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে, 'নারীদিবস' মানে যে 'নারীর অধিকার দিবস' তা' ওই ১৭৮৯ সালেই জাতীয় পরিষদের কাছে নারীদের পক্ষ থেকে দাখিল করা আবেদনপত্রে স্পষ্ট করা ছিল; নারী-পুরুষের সমান অধিকার, শ্রমের অধিকার, যোগ্যতানুসারে কর্মে নিয়োগ ইত্যাদির অধিকার। সেই থেকে 'নারী-অধিকার-রাজনীতি'র শুরু ফ্রান্সদেশে। আপনারা জানেন, নারী বর্জিত 'অধিকার ঘোষণা'র বছর দুইয়ের মধ্যে, ১৭৯১ সালে নারীসমাজের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয় Declaration of the Right of Women and Citizen। ক্রমে এই অধিকার-রাজনীতি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ও তাদের উপনিবেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে জন্ম নেওয়া বঞ্চনা-বৈষম্যের বিপরীতে শ্রমিকদরদি ভাবনা ও শ্রমিক আন্দোলন যে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল তা' সংহত হয়েছে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এ। তবুও নারী শ্রমিক, নারী-সমাজ বিষয়ে পৃথকভাবে নারীদের ভাবতে হচ্ছিল, পুরুষরাও নারীদের পক্ষে ভাবছিলেন। বিশেষ করে ব্রিটেনে। সচেতন পাঠকের মনে ছোট্ট একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, কেন?

এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা কোনও আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে এই সূত্রে একটি বইয়ের কথা বলতে হবে, ১৮৫১ সালে লেখা On the Enfranchisement of Women, লিখেছেন হ্যারিয়েট

টেইলর মিল। এই বইয়ে নারীমুক্তির কথা বলা হয়। নারীমুক্তির অন্যতম শর্ত নারীশিক্ষা, এই বিবেচনায় হ্যারিয়েট নারীশিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব রাখেন। পাশাপাশি যে সব আইন ও রাজনৈতিক নিয়ম নারীসমাজকে অধস্তনে পরিণত করে, সে সবের পরিবর্তন চান। এই বইটির উল্লেখ আর একটি কারণে, ১৮৬৯ সালে আর একটি বই লেখা হল, The Subjection of women, লিখলেন হ্যারিয়েট মিলের স্বামী, জন স্টুয়ারট মিল। এই বইয়ে হ্যারিয়েটের মুক্তি বিষয়ক মতামতের প্রতিফলন রয়েছে এবং রাখা হয়েছে, পুরুষ যে সকল অধিকার ভোগ করে সে সবই নারীকে দেওয়ার প্রস্তাব।

নারী আন্দোলন দেশে দেশে

অন্যদিকে, আমেরিকায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল, এই আন্দোলনের মধ্যেই ছিল নারী আন্দোলনের বীজ। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে তাঁদের দাবি জানান। এই জোটের প্রথম প্রকাশ্য সভা ১৮৩৩ সাল, কিন্তু সভা পণ্ড হয়েছিল বর্ণ বিদ্বেষীদের হামলায়। ''আমেরিকার দাসপ্রথা উচ্ছেদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তাঁরা বুঝেছিলেন যে, ক্রীতদাসরাই কেবল মালিকের দাস নয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরাও পুরুষের দাসত্ব করে। সুতরাং দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রকারান্তরে নারীদের মুক্তির সংগ্রাম ও নারীদের সমান অধিকারের সংগ্রাম।'' (নারী ও মানবাধিকার/রীনা পাল)।

আবার ইংল্যান্ডে যখন 'শ্রমিক মুক্তির ইস্তাহার' লেখা হচ্ছে, সেই ১৮৪৮ সালেই নারী অধিকার-রাজনীতির এক ইস্তাহার ঘোষণা করা হচ্ছে Seneca fals Declaration of Sentiments-এ চিরায়ত দাবিসমূহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সম্পত্তি ও ভোটাদানের অধিকার।

সমাজতন্ত্রের জন্য বিপ্লবের স্বপ্নোদ্দীপিত শ্রমিক আন্দোলন ইউরোপ-আমেরিকার দেশে দেশে ও ইউরোপের বিভিন্ন উপনিবেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন এক আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। এ-কথা আমাদের কম-বেশি জানা থাকলেও বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিষয়ে জানাবোঝাটা কম। এই শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেই ওই যুদ্ধ ক্রমে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলছিল। এই প্রেক্ষাপট আমাদের মনে রাখতে হবে এ-কারণে যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিসরে কমিউনিস্ট আন্দোলন শ্রেণীসংগ্রামকে এক বিপ্লবী যুদ্ধে রূপ দিতে চাইছিল; যাতে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম করা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই নারী শ্রমিকদের সমস্যা সমাজতন্ত্রবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে জার্মান দেশে। সে দেশের সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগণ্য নেত্রী ক্লারা জেটকিন, তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখ করে নারী অধিকার বিষয়ে দাবিগুলি কীভাবে পূরণের দিকে যাচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে ঃ ১) মেয়েদের ইউনিয়নগুলিতে সান্ধ্য ক্লাসের ব্যবস্থা করেছিলেন জেটকিন; ২) রাজনৈতিক অধিকার দাবী; ৩) কাজের সময়, পরিবেশ ইত্যাদির উন্নতির দাবি। এর ফলে জার্মান সোস্যাল ডেমক্র্যাট পার্টি মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবিকে সমর্থন করে। তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় 'সোসালিস্ট উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল'। এই সংগঠন পৃথিবীর সমস্ত সমাজতন্ত্রী দলের কাছে আহ্বান রাখে এই মর্মে যে, পুরুষের সার্বিক ভোটাধিকারের সমান অধিকার প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের দিতে হবে; এই আওয়াজ তোলা হোক।

প্রসঙ্গত, ঔপনিবেশিক ভারতে স্বতন্ত্রভাবে নারী-নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ঐতিহাসিক কারণেই তা সম্ভব ছিল না (জাত-বর্ণভেদ...)। কিন্তু উচ্চ বর্ণের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে পুরুষই উদ্যোগ নিয়েছে (সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে), সংস্কারপন্থীরা নারী অধিকারের পক্ষে কথা বলেছেন এবং ক্রমে মেয়েরা যুক্ত হচ্ছেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। গড়ে উঠছে স্বতন্ত্র নারী সংগঠন যা স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে নারীর অধিকার আন্দোলনে রূপ পেয়েছে। কিন্তু অধরা থেকে গেছে নারীর অধিকার, বিশেষ করে প্রান্তিক-দলিত নারীর।

মুক্তি — এক ধরনের ইল্যুশন, অধিকার চাই!

সন্দেহ নেই, সেই ফরাসী বিপ্লব পরবর্তী সময় থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত নারী আন্দোলন ছিল মূলতঃ নারীশ্রমিকের কাজের সময়, পরিবেশ, ছুটি ও সম্মানজনক বেতন-মজুরি পাওয়ার জন্য। এবং এই আন্দোলনে যে সব নারী নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের সমাজবাদী মতাদর্শের কারণে তা কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে পুষ্টি নিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হাত ধরে নারীমুক্তি ঘটবে, এমনও আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও নারী-পুরুষের 'বৈষম্য', এই বিষয়টি এক অমীমাংসেয় সমস্যা রূপে বিদ্যমান থেকেছে। অনুমান করা অসংগত হবে না যে,

এ-কারণে নারী আন্দোলন থেকে 'নারী দিবস', এক পৃথক পরিচিতি জ্ঞাপক বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৯১০ সালে 'সোসালিস্ট উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল' তাদের সম্মেলন থেকে ৮ই মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণা করার দাবি তোলে। এই বিশেষ তারিখটিও সম্পূর্ণভাবে নারী শ্রমিক আন্দোলনের স্মারক হিসাবে উঠে এসেছে। ১৮৫৭ সালে আমেরিকার বস্ত্রশিল্পের নারী শ্রমিকরা কাজের সময় কমানো ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন করেন, দিনটি ছিল ৮ই মার্চ। (এই সময়ে পুরুষ শ্রমিকের ভূমিকা কী ছিল, গবেষণার বিষয় হতে পারে)। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ রাখা জরুরি 'কমিউনিষ্ট আন্দোলনের স্বর্ণযুগ'ও নারীকে অখণ্ড মানবসত্তায় গ্রহণ করতে পারেনি। অথবা অন্যভাবেও বলা যায়, কমিউনিষ্ট মতাদর্শ নারীকে পুরুষ সংঘে গৃহীত হওয়ার মতো যোগ্য করে তুলে অখণ্ড মানবসত্তায় নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মানবসমাজে 'বন্দিত্ব'ই মুক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত নারীর অধিকারের প্রশ্নটি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। নারীর অধিকার কেবলমাত্র 'শ্রমিক' হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে তাঁর অধিকার আছে আর এই অধিকার কেবল নারীর নয়, অগণিত পুরুষেরও। তা' হল 'মর্যাদা'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, পৃথিবীতে যুদ্ধের কারণ হিসাবে যুদ্ধবাজ মানুষরাই আবিষ্কার করলেনঃ 'মানুষের সহজাত মর্যাদা' ও 'প্রত্যেকের সমান অধিকারসমূহের' স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। না-দেওয়ার কারণেই ঘটেছে দু'-দু'টি বিশ্বযুদ্ধ। আর ঘোষণা করা হল যুদ্ধবিরোধী 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র'। এই ঘোষণাপত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বেঁচে থাকার অধিকারে বিদ্যমান নানান জটিলতা (পাচার ও পতিতাবৃত্তি, রাজনৈতিক অধিকার, দাসত্ব, বিবাহিত নারীর জাতীয়তা, বৈষম্য বিলোপ) থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারেনি রাষ্ট্র। এ যেমন সত্য, তেমনই, তা' থেকে তাঁর ক্রম মুক্তির জন্য জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ কনভেনশনের মাধ্যমে নানান দলিল গ্রহণ করেছে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী দশক ঘোষণা করে নারী-উন্নয়নে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে; নারী জীবনের সংকটক্ষেত্র চিহ্নিত করে (দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সন্ত্রাস, নির্যাতন, যুদ্ধ, অন্যান্য সংঘর্ষ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ক্ষমতা বণ্টন ইত্যাদি)।

তত্ত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্র নারীকে পৃথক করে রেখেছে

দেশে-দেশে ও দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কার্যত কোনও পদক্ষেপ নিতে সরকার তার অঙ্গীকার মতো ব্যর্থ হয়েছে। ফলতঃ মানুষের মর্যাদা ও ঘোষিত অধিকার না-পাওয়ার ফলে, নারী-পুরুষ উভয়ই বেঁচে থাকার জন্য নিজেদেরকে পণ্য করতে যেমন বাধ্য হয়েছে, তেমনই ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত এক বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটানোর জন্য মানুষ পথেও নামছে। দেশের অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছে যুদ্ধের পরিবেশ। সাম্প্রতিক সময়ে, এই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে অভ্যন্তরীণ এই যুদ্ধের নানান মাত্রা, বিশেষ করে আমাদের দেশে। সেই সঙ্গে মানুষের বাজারেও মন্দা। সামাজিকভাবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে মেয়েরা। সমাজসচেতন মেয়েরা তবু 'নারীদিবস' পালন করেন। তাঁরা দৃপ্তকণ্ঠে স্লোগান তোলেনঃ নারী দিবস দিচ্ছে ডাক, পুরুষতন্ত্র নিপাত যাক ! অর্থাৎ নারী-পুরুষ স্বতন্ত্র সত্তা; পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে এভাবেই স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

তবু অখণ্ড মানবচেতনার পরিসর বিদ্যমান

আবারও বলা যাক, যে কর্মসূচি রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষণা রেখেছে, মানবাধিকার ঘোষণার মতোই সে সব কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্র তথা সরকারের। আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেক নাগরিকের তা সাংবিধানিক কর্তব্যও বটে ।

মানুষ হিসাবে নারীর অধিকার মানবাধিকারের অংশ, মানবাধিকার রূপেই তাকে কার্যকর করা পুরুষের দায়িত্ব (যেহেতু সমাজ পুরুষতান্ত্রিক)। নারীকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেওয়া মানবিক পুরুষের কাজ। যাতে নারী-পুরুষের সম্মিলিত মেধা-মননে উভয়ই 'মানব' রূপে পরস্পরের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারে (দৃষ্টান্ত- হ্যারিয়েট-স্টুয়ার্ট মিল)। অর্থাৎ সমাজকে মানবতান্ত্রিক রূপে বিনির্মাণ করা।

যদি প্রশ্ন করো

৮ই মার্চ কি রাষ্ট্রীয় উদ্‌যাপনের বিষয়? এ বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠনের ভূমিকা কী হতে পারে ? অবশ্যই

রাষ্ট্রীয় উদ্‌যাপনের বিষয়। আন্তর্জাতিক কর্মসূচির অংশ। আর মানবাধিকার সংগঠনের ভূমিকা? তা' স্থির করে নিতে হলে, একটি চিন্তন-ইস্যু হিসাবে বিষয় হিসেবে দেখতে হবে। বিষয়টি সংগঠনই ভালো বুঝবে। তবে, আমরা একটি স্লোগানের প্রস্তাব রাখতে পারি, নারী দিবস দিচ্ছে ডাক, মানবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাক।

নারী-অধিকার (একটি কাল্পনিক কথোপকথন)

মীরাতুন নাহার

—হ্যালো ম্যাডাম!

—হ্যালো, বলুন। আমি অরুণা হালদার বলছি।

— ম্যাডাম বলছিলাম, আপনার একটা প্রতিক্রিয়া চাই। আমি 'সংবাদ বাজার' সংবাদপত্র থেকে বলছি। আজকের ঘটনা, আদালতে একটি নাবালিকা অভিযুক্তকে চেনে-না বলেছে। অথচ বত্রিশ বছরের ছেলেটির বিরুদ্ধে তার বাড়ি থেকে নালিশ জানানো হয়। মামলা হয়। পুলিশ তাকে আদালতে তোলার দিন নির্যাতিতা নাবালিকার সামনে দাঁড় করানো পর ছেলেটিকে কখনও দেখেনি জানিয়েছে। অভিযুক্ত তাই ছাড়া পেয়ে গেছে। এমন ঘটনা এখন প্রায় ঘটছে দেখা যাচ্ছে। আইন কঠোরতম করা হয়েছে নারী-অধিকার হরণকারীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে। তবু সে আইন কাজে লাগছে না। কেন এমন হচ্ছে? আপনার মতটি যদি জানান।

—আপনার কী মনে হয়, শাস্তি কঠোর হলেই দেশ থেকে অপরাধ দূর হয়ে যাবে? অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্ক কী তেমন ব'লে আপনি বিশ্বাস করেন? আমার কিন্তু তা' মনে হয় না! আইনবলে অপরাধী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্তরা যদি কঠিন শাস্তি পায় তা'হলে আর কেউ তেমন অন্যায় ঘটাবে না, এমনটি হলে-তো ভালই হতো! কিন্তু দঃখের বিষয় হল, তেমনটি-তো বাস্তবে ঘটে না!

—না ম্যাডাম, আমি ঠিক তেমনটি ভাবি না। আমি বলছিলাম, নারী-নির্যাতনকারীদের প্রতি বিচারব্যবস্থা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নির্যাতিতা নিজেই যদি অসহযোগিতা করে তা'হলে এই প্রকার হীন অপরাধ বন্ধ করা যাবে কীভাবে?

এবং আপনার কাছে আমার প্রশ্ন একটি এবং নির্দিষ্ট। সেটি হ'ল— বিচারের শেষ পর্যায়ে গিয়ে অপরাধীকে চিনিয়ে দিতে ভিক্টিম নিজেই পিছিয়ে যাচ্ছে কেন? এর পিছনের কারণ কী ব'লে আপনার মনে হয়?

—কারণ একটি নয়। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কারণ থাকতে পারে। নির্দিষ্ট করে বলা তাই সম্ভব নয়।

কী রকম? একটু বলুন তবুও।

এক) হ'তে পারে পাড়ার 'দাদা'রা মেয়েটিকে ভয় দেখিয়েছে। 'মুখ খুললে বিপদ', শুনিয়েছে। দুই) পুলিশই হিতাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মবেশে তার ভালোর জন্য তাকে, না-চেনার ভান করতে বলেছে; অন্য পক্ষের কাছ থেকে 'নগদ' আদায় নিয়ে। তিন) আত্মীয়-স্বজনেরা ভবিষ্যতে আবার মেয়েটি আক্রান্ত হ'তে পারে ভেবে তাকে নির্দেশ দিয়েছে কালপ্রিটকে চিনতে না-পারার অভিনয় করতে; এমনও হ'তে পারে। চার) এমনও হ'তে পারে যে, মেয়েটি নিজেই আক্রান্ত হওয়ার নির্মম অভিজ্ঞতার কথা মনে করে ভয় পেয়েছে এবং ছেলেটির দিকে তাঁকিয়ে ভয়ে 'চিনি নাদ বলে ফেলেছে।

এমন সব সম্ভাব্য কারণের কথা বলতে বলতে, অরুণার মনে পড়লো; একটি টিভি চ্যানেলের আলোচনা শেষে বেরিয়ে এই-তো সেদিন মহিলা অধিকার রক্ষা সংস্থার অধিকার্তাকে বলতে শুনেছিল, 'অরুণা'দি জানেন, এইসব মেয়েরা টাকা-পয়সা নিয়ে অভিযোগ তুলে নেয়! আবার টাকা-পয়সা আদায় করার জন্য মিথ্যা অভিযোগও করে! আপনি আলোচনার মধ্যে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনারা কী করেন! এই অত্যাচারিত মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোই-তো আপনাদের মূল কাজ!' তখন সত্য কথাটা বলতে পারিনি! এখন বলছি, তাই। আমরা সাহায্য করতে গিয়ে বিপদে পড়ে যায়। সাংবাদিক ভদ্রলোকও সম্ভবত তেমন উত্তরই তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করে প্রতিক্ষা করেছেন, প্রতিক্রিয়া পাওয়ার। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপরে ভাবলেন, সংবাদ-মাধ্যমগুলিই-তো যত নষ্টের গোড়া! এদের একটু ঘা দেওয়া দরকার!

—আচ্ছা, আপনাদের ভূমিকার কথা কখনও ভেবেছেন? মেয়েদের অর্দ্ধ-নগ্ন শরীর দেখিয়ে পুরুষ ও মেয়েদের সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক নষ্ট করে চলেছেন আর অর্থ রোজগারের ঘোরে থেকে ভুলে গেছেন আপনাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার

কথা! পুরুষের মধ্যে লালসা নির্মাণে অন্যতম কারিগরের ভূমিকা নিয়েছেন আপনারা আর আর সেই লালসা স্বীকার হচ্ছে সাধারণ ঘরের নিরীহ মেয়েরা! তারপর আপনারা সে'সব খবর ছাপিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন খবরের পাতা। এরপর টাকা-পয়সা নিয়ে মেয়েদের অভিযুক্তকে না-চেনার দায় চাপাতে আমাদের মতো মানুষদের প্ররোচিত করছেন, তাই-না? শুনে নিন, আপনারা পুরুষদের মধ্যে বিকৃত কামনা জাগানোর প্রক্রিয়া বন্ধ না-করলে নিত্যদিনের নারী-নির্যাতন বন্ধ করার জন্য যত কড়া শাস্তির বিধান তৈরী হোক-না-কেন তা' কাজ করবে না।

—কী বলছেন ম্যাডাম? আমরা, আমরা! সংবাদ জগতের—!

—ঠিকই বলছি, আমি। আমার এই প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ করবেন দয়া করে। রোজ সকালে খবরের কাগজ খুললেই উত্তেজনা জাগানো নারী-শরীর নির্ভর বিজ্ঞাপনে সজ্জিত পাতাগুলি দেখলে বিকৃত কামনার বলি হওয়া মেয়েদের জন্য আপনাদের মিথ্যে উদ্বেগ প্রকাশকে ধিক্কার দিতে দিতে ক্লান্ত হূএ পড়েছি, জানবেন। এই প্রকার দ্বি-চারিতা কত আর সওয়া যায়! তবু সইতে হচ্ছে। কী করে নিরীহ সুবিধা-হারা গরীব ঘরের মেয়েদের দোষ দেবেন-দেখি বলুন-তো? তারাই কেবল টাকা-পয়সা-ভয়-লোভ , এসবের শিকার হয়?

—না, না, না-ম্যাডাম! আপনি রাগ করবেন না।

অরুণা ফোন কেটে দিয়ে ভাবলেন, কাল তাঁর প্রতিক্রিয়াটি আর প্রকাশ পাবে না! বাঁচা যাবে! আর কোনওদিন এই ধরণের প্রতিক্রিয়া নেওয়ার কর্ত্তব্য-পালন-র্ত সাংবাদিকের মনমতো উত্তর তাঁকে দিতে হবে না!

পরের দিন সকালে পেপারে চোখ রেখে হতবাক হলেন, অরুণা। তাঁর ছবি সহ, তাঁর মত প্রকাশিত হয়েছে; আরও কয়েকজনের অভিমতের পাশাপাশি গুরুত্ব সহকারে দু'-তিনটি বাক্যে। প্রখ্যাত লেখিকা অরুণা হালদারের মতে, ''অভিযুক্তরা বহুক্ষেত্রে নির্যাতিতা-ধর্ষিতা নাবালিকাদের তুলনায় প্রভাবশালী হয়। সে-কারণে, নির্যাতিতার পরিবার-পক্ষ নানা প্রকার প্ররোচনার ফাঁদে পড়ে অপরাধীকে চিনতে না-পারার কথা বলে এবং তা'তে আইনের ফাঁক গলে অপরাধীরা শাস্তি পাওয়া থেকে রেহাই পেয়ে যায়। এভাবে আইনে কড়া সাজার ব্যবস্থা থাকলেও তা' কার্যকর হ'তে পারে না।''

অরুণা গরম চায়ে মুখ দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখলেন, মুখ থেকে। সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সকালের বার্তা নিয়ে ঘর-ময়। সে-আলো অরুণা'র মুখেও পড়েছে। তবু, সে মুখ থম থমে, অন্ধকার। মন-মনে বলে উঠল, হায়! নারী-অধিকার!

নারী আন্দোলন অধিকার চেতনা কি বাস্তবে চেতনার সংঘাত?

নিশা বিশ্বাস

''আমি কী চিজ জানেন তো! চিজ মানে কিন্তু মাখন নয়, আমি কী মানুষ জানেন তো!''

—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগরদীঘি, ১৬/০১/২০২৩

মেয়েরা সবাই খুবই ছোটো বয়স থেকেই জানে যে 'চিজ মানে মাখন নয়'। তাদেরকে জন্ম থেকে মেয়ে হওয়ার পথই জানিয়ে দেয় যে তারা আর যাই হোক-না কেন 'চিজ'বা দ্রব্য-সামগ্রী তো বটেই। স্কুল কলেজে, বন্ধুদের আড্ডায় মুখোমুখি শুনতেও হয় যে তারা কেবলমাত্র 'চিজ' নয় তারা পটকা, মাল, জিনিস আরও কতো কি। তাই মমতা বন্দোপাধ্যায় যখন ব্যাখ্যা করে নিজেকে 'চিজ' বলেন কেমন যেন ধাক্কা লাগে!

গণ্ডগোল বাধায় মা! মায়েদের যে কত বড় মিথ্যের সাথে মেয়েরা বড় হয়, তা কি মায়েরা জানে? মেয়েরাও কি জানে? মায়েরা বলে, 'ভালো করে পড়াশুনা করো, অর্থকরী শ্রমে যোগ দাও, ঘরের গন্ডি পেরিয়ে বাইরে পা রাখলেই দেখবে সমাজটা পাল্টে গেছে'। মায়েরা নিজেদের গৃহস্থালির কাজকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেনি, করানোও হয়নি। না-কী শেখেনি! তাই অর্থকরী শ্রমে যোগ দেওয়াকে প্রাধান্য দেয় মা। অর্থ উপার্জন করতে পারলেই হবে 'স্বাধীন'! যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা বেড়াবে, ইচ্ছা হলে বিয়ে করবে, কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে হবেনা। স্বাধীন হবে, স্বাধীন! কিন্তু মেয়ে কি স্বাধীন হল? হল কি মুক্ত? নাকি আমরা অর্থাৎ মেয়েরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম! অর্থ উপার্জন করলেও কি খরচের অধিকার আছে মেয়েদের? বাইরে বেরোনোর যে খেসারত দিতে হবে তা তো মা বলেনি। মেয়েকে বলেনি যে,

তাকে আজীবন পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। হতে হবে সমাজনির্ধারিত দুরূহ মাপদন্ডে ভালো মেয়ে, ভালো মা, ভালো গিন্নী, ভালো বউ। তাকে হতে হবে 'অষ্টগুণ' সম্পন্ন! আজও তাকে হিন্দু পুরাণের মতে হতে হবে - 'কার্যেষু দাসী, কর্ণেষু মন্ত্রী, ভোজেষু মাতা, শয়নেষু রম্ভা, রুপেষু লক্ষ্মী, ক্ষমায়েষু ধরিত্রী, সৎকর্মে নারী, কুলধর্মে পত্নী'। কাজের জায়গাতেও তার পরিত্রাণ নেই। সে যে দক্ষ কর্মী তা তাকে আজীবন প্রমাণ করতে হবে। সহকর্মীরা মনে করে যে সে তার লিঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ নিচ্ছে। মা বলেছিল তুই আমার মত জীবনযাপন করবি না। যে'টা বলেনি সেটা তশোনো মেয়ে, তোমার জন্য আমার স্বপ্ন কিন্তু স্বপ্নই থাকবে! আমার মাও দেখেছিল! সার্থক হয়নি! তাই তৈরী হও মেয়েবিদ্বেষী পুরুষপ্রধান সমাজের জন্য! প্রস্তুত হও আজীবন যুদ্ধের জন্য, সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে, ঘরে ও বাইরেদ!

দেশ স্বাধীন হয়ে ৭৫ বছর হ'লো, দেশের মেয়েরা কি স্বাধীন হলো? কি হলো তাদের? আমাদের দেশে ফৌজদারী আইন সবার জন্য এক থাকলেও ব্যক্তিগত আইন অর্থাৎ পরিবারের সদস্যের দায়িত্ব - কর্তব্য - অধিকার; বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানের হেফাজত, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ হয় সম্প্রদায় ভিত্তিতে। সব সম্প্রদায় পুরুষপ্রধান বলে সমস্ত ব্যক্তিগত আইনই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। তারা নির্ধারণ করে মেয়েদের জীবনযাপনের পথ। সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদ দেশের নাগরিক হিসাবে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হলেও অনুচ্ছেদ ২৫ প্রদত্ত ধর্মীয় আচরণের স্বাধীনতা বন্ধ করে দেয় সেই পথ। উন্মোচিত হয় রাষ্ট্রের নারীবিদ্বেষী সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক রূপ।

তাই দেশের মেয়েরা মনে করলো যে ধর্মের এই শোষণ থেকে রেহাই দেবে 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' (অদেবি) যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Uniform Civil Code (UCC)। বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে গঠিত 'স্ট্যাটাস অব উইমেন' কমিটির (১৯৭৪-৭৫ সালে) রিপোর্ট 'টুওয়ার্ডস ইকুয়ালিটি' দেশে মেয়েদের শোচনীয় অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রিপোর্ট মেয়েদের শিক্ষার অবহেলা এবং ক্রমিক লিঙ্গানুপাত হ্রাসের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৮৮ সালের 'ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ প্ল্যান অন উইমেন' বলে ব্যক্তিগত আইন সংবিধানপ্রদত্ত সমান অধিকারের (অনুচ্ছেদ ৪৪) বিরোধী এবং ২০০০ সালের মধ্যে অদেবি গৃহীত হবে। অন্য দিকে ১৯৯০ সালেও নারী ও শিশুকল্যাণ বিভাগ সিদ্ধান্ত নেয় যে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় থেকে দাবি না উঠলে সরকার নিজে থেকে কোনও উদ্যোগ নেবে না। এর মধ্যে নারী সংগঠনগুলি সোচ্চার হয়ে উঠলো, অদেবির দাবিতে।

১৯৮৬ সালে ঘটল শাহবানু মামলা। আনা হলো মুসলিম নারী আইন। খোলা হলো রাম মন্দিরের কপাট। হলো আদবানীর রথযাত্রা, রাম মন্দির শিলান্যাস, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুম্বাই বিস্ফোরণ। বিজেপি তার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করলো অদেবির দাবি। শঙ্কিত হলো নারী সংগঠনগুলি ও নারীকর্মীরা। তারা বুঝলো যে বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দল আসলে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে অদেবি'র দাবী তুলছে। শুরু হলো অদেবি'র দাবি থেকে পিছু হটা। উঠলো গোষ্ঠীর ভিতর থেকে সংস্কারের দাবি, আগে চাই বিবাহ ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার।

১৯৯৫ সালে রায় এলো সরলা মুদগল মামলার। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলো যে যদি কোনো হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রথম বিবাহ বজায় রেখে দ্বিতীয় বিবাহ করে তাহলে সেই দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট অদেবি'র প্রণয়নের কথা বলে। তালাক-ই-বিদাত (তিন তলাক) প্রথার আইনি বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সাম্প্রতিক শায়রা বানু মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট আর একবার অদেবি'র গুরুত্বের উপরে জোর দিয়েছে।

এর মধ্যে আইন যে হয়নি, তা-নয়। হয়েছে। পারিবারিক হিংসা রোধের আইন, ধর্ষণে রোধের আইন, কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইন, লিঙ্গ হিংসা প্রতিরোধ আইন, সমকাজে সমান পারিশ্রমিক, শিক্ষার অধিকার, সুরক্ষার অধিকার, কাজের অধিকার ইত্যাদি। আইন রয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রে, কিন্তু তা'তে কী মেয়েদের জীবন সহজ হয়েছে?

আজও ভারতের মেয়েরা বিশ্বের নারীদের মধ্যে সর্বাধিক অতিরিক্ত পরিশ্রম করছে। তাদের দিনে গড়ে ২৯৯ মিনিট গৃহকাজে এবং ১৩৪ মিনিট শুশ্রুষাকাজে ব্যবহৃত হয়। তাদের বাড়ির অন্তত ৮২ শতাংশ কাজ করতে হয়। অল্পবয়স থেকেই বাড়ির কাজের চাপে শিশুকন্যারা বাধ্য হয় স্কুল ছাড়তে। মেয়েদের বিরত হতে হয় অর্থকরী শ্রমে যোগদান থেকে। যারা কোনোভাবে এই শ্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় তাদের

পেশায় থাকার শর্তই হলো 'ডবল শিফট'। গৃহকর্ম, বাচ্চাদের যত্ন, বয়স্ক ও অসুস্থদের যত্নাদির কাজ মেয়েদেরই। চাকরী করুক আর না করুক কোনো তফাৎ নেই।

সামাজও মেয়েদের সাথে নেই! আজও যে পরিবারের নারী পুরুষ উভয় রোজগারের জন্য বেরোয় সেখানেও বাড়ির কাজ, রান্নার কাজ ইত্যাদি সবটাই মেয়েদের সামলাতে হয়। প্রথমত বাড়ির ছেলেরা এগিয়ে আসে না। আর যদিও বা আসে 'ওমা সে কি লজ্জা!' এই ভাব দেখানো হয়। ভিতরে ও বাইরে সবাই মেয়েটার এমন নিন্দা করবে যে তার কথা বলাই ভার হয়ে উঠবে। উপদেশের ধাক্কা সামলানোর থেকে ভালো আর একটু খেটে মরা! তারা সর্বদা চেষ্টায় থাকে, যে কোনো মুল্যে, তার জীবনের এই লজ্জাজনক অধ্যায় লোকের চোখের আড়ালেই যেন থাকে।

কাজের জায়গার অবস্থা তো আরও দুরূহ। সেখানে তো 'ব্রোটোপিয়া'—পুরুষকর্মীদের ক্লাব, যেখানে পুরুষকর্মী সহ-পুরুষকর্মীর স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। মেয়েকর্মীর জন্য কোনো স্থান নেই। *লেখক এমিলি চাং টেক-কোম্পানির ২০০র বেশী শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তা, বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে তার 'ব্রোটোপিয়া ব্রেকিং অফ দ বয়'স ক্লাব অফ সিলিকান ভ্যালি' বইতে সিলিকন ভ্যালিতে পুরুষ-প্রাধান্য এবং লিঙ্গ অসাম্যের বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন যে, বিশ্বে সেরা হাই-টেক কোম্পানিগুলিতে প্রতিভা মানে হচ্ছে পুরুষকর্মীর 'টগবগে' আত্মবিশ্বাস। আর এই 'টগবগে' আত্মবিশ্বাস মেয়েকর্মীদের মধ্যে না-কী দেখতে পায় না কর্তৃপক্ষ!

বিগত দুই বছরের কোভিডকালে কাজ হারালো অনেকে। কাজ হারানো ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশী। স্কুলকলেজ বন্ধ। কাজ থাকলেও কমলো আয়। অন্যরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকরা পৈত্রিক ভিটেবাড়িতে ফিরতে বাধ্য হয়। একমাত্র সম্বল ১০০ দিনের কাজ! ছেলে-মেয়েদের পড়াবে কি করে? যে মেয়েরা ১০০ দিনের কাজ করছিল, তারা বাধ্য হয় সেই কাজ তুলে দিতে বাড়ির পুরুষের হাতে। লকডাউন খোলার পর শ্রমিকরা হল শহরমুখী। বাড়িতে থাকলো বউ-বাচ্চারা। অসংখ্য ছেলে-মেয়েরা হল স্কুল-ছুট। ছেলেরা যোগ দিল অর্থকরী কাজে, ছোট ছেলেরা ফিরলো স্কুলে আর মেয়েরা বেশ কম সংখ্যায় ফিরলো পড়াশুনায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে হলো রমরমিয়ে। মেয়েপাচারের সংখ্যাও বাড়লো বেশ। কিন্তু চিন্তা করবে কে? সরকার বলে দিলো তথ্য নেই। রাজনৈতিক দলগুলিও উদাসীন। কারণ 'এরা তো ভোট-ব্যাংক নয়'!

এখন আমরা দেখছি, একটি বিশেষ সম্প্রদায়েকে প্রতারণার লক্ষ্যে কীভাবে পকসো আইনের সাথে বালবিবাহ নিরোধক আইনকে কাজে লাগাচ্ছে; অসমে হেমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। বালবিবাহ রোধের নামে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মা, বাবা এবং স্বামীকে জেলে কী পুরে রাখা যায়! মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রশিক্ষণ না-দিলে সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে কাজ না-করলে কিন্তু বালবিবাহ এবং মেয়েরা কচি বয়সে মাতৃত্বের ভার থেকে রেহাই পাবে না। এই প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রায় অসম্ভব। যেখানে মেয়েদের সন্তান উৎপাদক ছাড়া অন্য কোনও ভুমিকায় দেখা হয় না।

সংখ্যাতত্বের বিচারে এ দেশে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে কিছু কম হলেও ভোটদাতা হিসাবে তাদের গুরুত্ব রয়েছে। তাই রাজনৈতিক দলগুলোতে তাদের স্থান কম হলেও আছে। কিন্তু থেকেই বা কি লাভ! তাদের সামনে রেখে পুরুষরাই সব নিয়ন্ত্রন করে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে লেখা থাকে, কৃষিতে সমান মজুরি থেকে মেছুনিদের জীবন-জীবিকার সমস্যা, পড়াশুনা থেকে কাজের বাজারে প্রবেশে সহায়তা, নির্যাতন থেকে মুক্তি, পেশাদারি শিক্ষার উপরে জোর আরও কতো কি! কিন্তু সবটাই প্রতিশ্রুতি। যেমন শিশুকন্যাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পুষ্টি!

কৃষক আন্দোলন জয়ী হয়েছে। ৩৮০ দিন ধরে ছেলেমেয়ে, বড়-ছোট নির্বিশেষে হাজারে হাজারে মানুষ আন্দোলন করেছিলো দিল্লী সীমান্তে সিংঘু, তিকরি, গাজিপুর, শাহ্জাহানপুর ও পলবল এলাকায়। মেয়েদের ভাগীদারি ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা রাস্তায় ১৮ জানুয়ারি ২০২১ এ পালন করে, 'মহিলা কিষাণ দিবস' এবং ৮ মার্চে 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস'। কিন্তু যখন বাংলার মৌমিতা আন্দোলনকে সংহতি জানাতে গিয়ে দিল্লির ট্রেনে সাথী আন্দোলনকর্মীদের হাতে যৌন নির্যাতনের স্বীকার হলো। এবং করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল আন্দোলনের অনেকেই তার পাশে ছিল না। এক বছরের বেশী সময়েও আন্দোলনে মেয়েদের যৌন নির্যাতন নিয়ে কোনো নির্দেশিকা তৈরী করা গেলো না। মেয়েদের চাষের জমির যৌথ মালিকানার প্রশ্নও

তোলা গেলো না। বলা হল, যদিও মেয়েরা চাষে সমান কিংবা বেশী পরিশ্রম করে, যদিও তারা তাদের স্বামী, বাবা, ভাইদের জমি রক্ষার লড়াইতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে কৃষিজমিতে তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবি করা যাবে না। সম্পত্তিতে মেয়েদের আইনী অধিকার থাকা সত্বেও ক'টা মেয়ে পৈত্রিক অথবা শ্বশুরের সম্পত্তিতে ভাগ পায়? আন্দোলন-গুলোর মধ্যেও পিতৃতান্ত্রিকতার মূল গভীরে। উপড়ে ফেলা সহজ নয় তবুও দাবী তুললেই হবে। দুখ হয়, যখন কৃষক আন্দোলনের মত অগ্রণী আন্দোলনে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপরে উঠে মেয়েদের দাবী উঠতে পারেনা এই বলে যে, আগে তিনটি দমনাত্মক কৃষি আইন বাতিল হোক।

আজাদির অমৃতকালের প্রাক্কালে ২০১৫ সালে, দেশের সরকার লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ, কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধের লক্ষ্যে আনলো 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' নামের এক অভিনব সামাজিক অভিযান। যার লক্ষ্য হল, শিশুকন্যার সার্বিক বিকাশ। প্রধানমন্ত্রী ২২শে জানুয়ারী ২০১৫ সালে, প্রকল্পটি সূচনা করেন। নারীকল্যাণ বিষয়ক সংসদীয় কমিটি ৪ঠা আগস্ট, ২০২২-এ তাঁদের ষষ্ঠ রিপোর্টে বলছে যে, 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৭৮.৯১ শতাংশ বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রকল্পের শুরু থেকে সাম্প্রতিক রিপোর্ট অবধি প্রত্যেকটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছর প্রকল্প বাস্তবায়নের তুলনায় বিজ্ঞাপনেই খরছ হচ্ছে অনেক গুণ বেশী। কোনো প্রকল্পের যদি সিংহভাগ টাকাই বিজ্ঞাপনে ব্যয় হয় তাহলে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে কি করে!

২৬শে আগস্ট ২০১৬ সালে, পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত সাক্ষী মালিককে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার ঘোষণা করা হয়। বাস-কন্ডাক্টর বাবা ও স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুপারভাইজার মায়ের মেয়ে সাক্ষী মালিক হলেন একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মহিলা কুস্তিগীর। তিনি ২০১৬ সালে, অলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় নারী হিসাবে কুস্তিতে পদক জয় করেন। তখন থেকেই তাঁকে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযানের ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডার করা হয়। লজ্জা ও দুখের বিষয় যে, ঐ সাক্ষীকেও বিনয় পোগাট, অংশু মালিকের মতো আন্তর্জাতিক স্তরের কুস্তিগীরদের সাথে দিনের পর দিন জানুয়ারির ঠান্ডায় যৌনহেনস্থায় অভিযুক্ত কুস্তিসংঘের অধ্যক্ষ বৃজভুষণ সিং এর অপসারণের দাবিতে যন্তরমন্তরে অবস্থান ধর্মঘটে বসতে হ'ল। যে-মেয়েরা দেশের মেয়েদের খেলায় অনুপ্রাণিত করে, যাঁরা বিশ্বে খেলায় দেশের নাম উজ্জ্বল করে, পদক জিতলে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কলের মাধ্যমে তাঁদের অভিনন্দিত করেন ও সারা দেশে সম্প্রচার হয় তাঁদের খেলা। সেই তাঁরা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ জানাতে বসে রইলো যন্তর-মন্তরে। কেউ শুনলো না তাদের কথা! ১৪০ কোটির দেশে বারে বারে প্রশ্ন ওঠে, কেন আমদের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড় নেই! পিছিয়ে কেন! আমরা কী মেয়ে খেলোয়াড়দের অনুশীলনের সুস্থ পরিবেশ গড়তে পারছি!

২০১৭ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ কুলদীপ সিং সেঙ্গার দ্বারা নির্যাতিতা এবং ধর্ষিতা উন্নাওএর কিশোরীর সংর্ঘষের কথা মনে আছে? একই আশঙ্কা আছে ২০০২-এ গুজরাত হিংসার নিপীড়িত ও গণধর্ষণের শিকার বিলকিস বানোর। দীর্ঘ অসম লড়াই লড়ে অপরাধীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও কি হবে তারা আইনের ফাঁক দিয়ে ঠিক বেরিয়ে এলো। পেল, বীরোচিত সম্মান। আজ আবার বিলকিস, তাঁর পরিবার ও সাক্ষীদের থাকতে হচ্ছে গোপনে সেই ২০ বছর আগের ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে।

সেপ্টেম্বর ২০২২ সালের উত্তরাখণ্ডের 'বনান্তর' রিসর্টের রিসেপশনিস্ট অঙ্কিতা ভান্ডারী হত্যা কান্ড আর একবার প্রশ্নের মুখে দাঁড করাচ্ছে পুরোপুরি চুরমার হয়ে যাওয়া ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাকে। ১৯ বছরের অঙ্কিতাকে রিসোর্টের মালিক পুলকিত আর্য রিসোর্টের বিশেষ অতিথির সাথে যৌন সম্পর্ক করতে বাধ্য করছিল। দেহব্যবসায় নামতে রাজী হয় না বলে এবং রিসোর্টে চলা অনৈতিক কাজকর্মের বিষয় বাইরে জানিয়ে দেবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়ার ফলে মরতে হয় তাকেও। ১৯ বছরের অঙ্কিতা কাজে যোগ দিয়েছিল মৃত্যুর মাত্র ২০ দিন আগে। ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত থেকে নিখোঁজ অঙ্কিতার অভিযোগ দায়ের করতে তাঁর বাবার লাগে তিন দিন। নিখোঁজ হওয়ার ৬ দিন পরে হৃষিকেশের কাছে চিলা খাল থেকে উদ্ধার করা হয় তার দেহ। অটপ্সি রিপোর্টে জানায় যে অঙ্কিতার দেহে ভোঁতা জিনিসের আঘাতের চিহ্ন ছিল। এখানে বলে রাখা দরকার যে, পুলকিত হচ্ছে উত্তরাখণ্ডে বিজেপির নেতা ও ওবিসি মোর্চার জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য বিনোদ আর্য'র ছেলে। মহিলা সংগঠনগুলির ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এর তদন্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে রিসোর্টকে তড়িঘড়ি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে ফেলা হয় ২৭শে সেপ্টেম্বরে। কর্মক্ষেত্রে যৌনহেনস্থা প্রতিরোধ আইন

২০১৩ সাল থেকে চালু কিন্তু বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব যাদের তাঁরাই উল্লঙ্ঘন করছে। দায়িত্ব পালন করবে কে? বিশেষ করে অভিযুক্ত যদি রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়!

অ্যাসিড হামলা হচ্ছে প্রতিদিন। কঠোরতম আইন থাকা সত্বেও দেশে প্রতিমাসে অন্তত ১০০টি অ্যাসিডের আক্রমণ হয়। অ্যাসিডের ক্ষত ও যন্ত্রণা নিয়ে বাঁচতে হয় সারা জীবন। সুরাহা কি? আইন আছে। অ্যাসিড বিক্রির নির্দেশিকা রয়েছে কিন্তু মানে কে? আজও পাড়ার যে কোনও দোকানে প্রকাশ্যে পাওয়া যাচ্ছে অ্যাসিড। গাড়ির নীচে আটকে থাকা

রাষ্ট্র কী চোখে দেখে মেয়েদের? উপদ্রুত অঞ্চলে তো মেয়েদের শরীর হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। মণিপুরের থাংজাম মনোরমার কথা মনে আছে? মনোরমাকে প্রবল অত্যাচার ও ধর্ষণের পর গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল সেখানকার জননীরা। দাবী ওঠে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফস্পা) এবং উপদ্রুত এলাকা আইন বাতিলের। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় শান্তি ফিরলে আইনগুলি পাকাপাকি ভাবে তুলে নেওয়া হবে। ১৯ বছর হতে চলেছে, একজন অভিযুক্তকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়নি।

একই ভাবে রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীর হাতে অত্যাচারিত হচ্ছেন কাশ্মীরী মেয়েরা। কুনান পোশপোরা গণধর্ষণের অত্যাচারিতারা ন্যায় বিচার পায়নি আজও। পায়নি ন্যায় সোফিয়ার বউদি ও ননদ যাদের ধর্ষণ করে নালায় ফেলে দেয় মিলিটারির জওয়ানরা। তেমনি সুস্থভাবে থাকতে পারছে না বাস্তারের মেয়েরা। থানায় ডেকে ধর্ষণ, যৌন হেনস্থা, সশস্ত্র বাহিনীর হাতে মার খাওয়া যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের আর কী ভবিতব্য!

দেশ না কী অমৃতকালে পদার্পণ করেছে! মেয়েদেরও কী এটা অমৃতকাল? এই যদি অমৃতকাল হয় তাহলে একে বিষকাল বলাই ভালো! অন্তত মেয়েরা এই ভ্রান্তিতে থাকবে না, যে দেশ নারীকে দেবীসম পুজো করে বলে দাবি করে, সেদেশে তাদের সম্মান কেবল একটি 'মিথ'। আসলে মেয়েদের আজীবন লড়ে যেতে হবে সেই লড়াই যা তাদের মা লড়ছিল, মায়ের মা লড়েছিল এবং লড়তে হবে তার মেয়েকেও যতই মুক্তির স্বপ্ন দেখুক না কেন। তাহলে কি মেয়েরা খেলায় যাবে না? পড়াশুনা করবে না? কাজে বেরোবে না? না! তাদের পড়তে হবে, খেলতে হবে আর কাজেও বেরোতে হবে। লড়তে শেখাচ্ছে কাশ্মীরের ও বাস্তারের আদিবাসী মেয়েরা, মণিপুরের মায়েরা, শাহবানু থেকে অঙ্কিতা সবাই। লড়াই দীর্ঘ, কঠিন কিন্তু ছাড়লে চলবেনা। যতই মনে হোক, অধিকার চেতনা বাস্তবে চেতনার সংঘাত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখে চোখ রেখে জানিয়ে দিতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপধ্যায় নিজেকে 'চিজ' বলে দম্ভ প্রকাশ করলেও মেয়েরা কিন্তু 'চিজ' নয়। 'চিজঃ দ্রব্য, সামগ্রী। শব্দটি যে এ-ক্ষেত্রে নারী'র অবমূল্যায়ণ ঘটালো, আমরা কী বুঝতে পারলাম!

সংগঠন সংবাদ

এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলা কমিটি

* ৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গড়িয়া, প্রগতি পাঠভবন হলে। উপস্থিত প্রায় ৫৪ জনের মধ্যে বিভিন্ন শাখার ১২ জন প্রতিনিধি এই সভায় বক্তব্য রাখেন।

* ৬ ডিসেম্বর মহেশতলা-মেটিয়াবুরুজ শাখার প্রতিবাদ সভা মেটিয়াবুরুজে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস, সাম্প্রদায়িক ঘৃণার রাজনীতি ও বে-নাগরিককরণের বিরুদ্ধে এই সভা এলাকার মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগায়।

* ৭ জানুয়ারি ডায়মন্ড হারবার শাখার পথসভা হয় ডায়মন্ড হারবার স্টেট বাস স্ট্যান্ডে। বিষয়ঃ এনআরসি, ইউএপিএ সহ সমস্ত ভয়াবহ আইন বাতিল এবং রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি।

* ১৮ ফেব্রুয়ারি মৈপীঠ শাখা (প্রস্তুতি কমিটি)'র সাইকেল মিছিল। সুন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকার উপর বনদপ্তরের ধারাবাহিক আক্রমণ, বনদপ্তরের '১০০ দিনের কাজ' প্রকল্পের প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা বকেয়া মেটানোর দাবিতে এই সাইকেল মিছিল আয়োজন করে। মৈপীঠের পয়লা ঘেরি থেকে কুলতলীর কাঁটামারি বাজার পর্যন্ত এই মিছিলে প্রায় ৩৫ জন সাইকেল আরোহী অংশগ্রহণ করেন।

* ২৭ ফেব্রুয়ারি কাকদ্বীপ নামখানা শাখা (প্রস্তুতি কমিটি) বকখালীর রেঞ্জার অফিসে এক বিক্ষোভ-ডেপুটেশন সংগঠিত করে। বকখালি রেঞ্জার অফিসের নাকের ডগায় ত্রিশ একর জঙ্গল দু দফায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

আম্মা (AMMA) : কর্মস্থল বা পরিবার কোনটাই আর আগের মত থাকবে না

রঞ্জিত শূর

লকডাউনের মধ্যে জন্ম। অস্বাভাবিক, অন্যরকম সময়। যখন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি ছিল, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। সে সময় আরও বেঁধে বেঁধে থাকার তাগিদে জন্ম হয়েছিল 'আম্মা' সংগঠনেরঃ অ্যাসোসিয়েশন ফর মিড ডে মিল অ্যাসিস্ট্যান্টস। স্কুলে স্কুলে মিড-ডে মিল রান্না করেন যে মহিলারা তাঁদের সংগঠন। রান্না করেন বললে ভুল বলা হবে । অধিকাংশ জায়গায় দূর-দূরান্ত থেকে রান্নার উপযুক্ত জল টেনে আনা, রান্নার জায়গা পরিষ্কার করা, জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের তত্ত্ব-তালাশ করা, বাচ্চাদের খাবার দেওয়া, থালা-বাসন ধোয়ামাজা করা, বাচ্চাদের খাওয়া শেষে খাওয়ার জায়গা নিকানো। এই সমস্ত কাজ যারা করেন তাঁদের সংগঠন। বেঁচে থাকার, না, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার নয়, মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকার প্রবল তাগিদে ব্লকে ব্লকে জেলায় জেলায় ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন এই মহিলারা। আম্মার ব্যানারে। সংগঠনের নামটিও রেখেছেন চমৎকারঃ আম্মা অর্থাৎ মা। মায়ের যত্নে যারা স্কুলের বাচ্চাদের প্রতিদিন দুপুরের খাবারটা মুখে তুলে দেন।

নদিয়ার শান্তিপুর থেকে শুরু হওয়া এই সংগঠন ক্রমশই ডানা বিস্তার করছে জেলায় জেলায়। সম্প্রতি সংগঠনের উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা সম্মেলন হয়ে গেল বারাসাতের রবীন্দ্রভবনে। কিছুদিন আগেই বারাসাতে হয়েছিল বিশাল মিছিল। দাবি-দাওয়া নিয়ে গিয়েছিলেন জেলা শাসকের কাছে। কিন্তু জেলা শাসক ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। ৫ মিনিট সময় দিতেও রাজি হননি। শুনতেই রাজি হননি দাবি-দাওয়া। সেই অসম্মান জেদ বাড়িয়ে দিয়েছিল আম্মাদের। সঙ্গে পেয়েছেন কিছু আদর্শবাদী যুবক-যুবতীকে। প্রতিজ্ঞা ছিল সবাইকে এক ছাতার নীচে এনে সংগঠন তৈরী করে প্রতিবাদের ঝড় তুলবেন। এই প্রশাসনকেই বাধ্য করবেন সংগঠনের সঙ্গে বসে তাঁদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সুষ্ঠভাবে আলোচনা করতে। কাজটা সহজ ছিল না। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে এঁদের অনেকেই নানা সময়ে রবীন্দ্রভবনে আসেন। জেলাশাসক, এসডিও, বিডিওদের বক্তৃতা শোনেন। নেতা-মন্ত্রীদের বক্তৃতা শোনেন। সেই রবীন্দ্রভবনের মঞ্চে ওঠে সেই চেয়ারে বসবেন, যে চেয়ারে ডিএম, এসডিও, বিডিও'রা বসেন, এটা ভাবতেই পারছিলেন না! রান্নার কর্মীরা এসডিও, বিডিও, ডিএম-এর চেয়ারে বসে প্রাথমিক জড়তা কাটাতে সংগঠকদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এইরকম ঝলমলে হলে, মঞ্চে! সমস্ত আলো তাঁদের মুখেই পড়ছে। সে অবস্থায় বক্তব্য রাখছেন সেই শিহরণ- 'সংকট' কাটিয়ে সাবলীল হতে দেখাটাও একটা অভিজ্ঞতা। মাইক হাতে তারপর আর পিছন ফিরে তাকানো নয়। নদিয়ার পর জন্ম হলো উত্তর চব্বিশ পরগণা'য়, আম্মার দ্বিতীয় জেলা কমিটি। কানায় কানায় পূর্ণ রবীন্দ্রভবনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এলো সমস্যাগুলি। সমস্যার মূলত দু'টি দিক। একদিকে শিশুদের অপুষ্টি , অন্যদিকে আম্মাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদার দিক।

সংগঠনটি মিড-ডে মিল কর্মীদের। কিন্তু সম্মেলনে গৃহীত দাবি-সনদে, যার ভিত্তিতে আগামী দিনে রাস্তায় নামবে সংগঠন। প্রথম দাবিটি হ'লঃ বাচ্চাদের রোজ অন্তত একটা করে ডিম দিতে হবে। এবং মিড ডে মিল খাতে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। মিড ডে মিলে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে বাচ্চাদের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ৫ টাকা ৪৭ পয়সা। উচ্চ প্রাথমিকে আট টাকা সাত পয়সা। এই টাকার মধ্যে কী ভাবে একটা বাচ্চাকে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া সম্ভব! সেই ক্ষোভের কথা উঠেলো বারবার। একটা সরকার কী ভাবে এই পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করতে পারে যেখানে শুধু একটা ডিমের দামই ৬ টাকার উপরে! তেল ডাল আলু সয়াবিন সবকিছুর দামই আকাশছোঁয়া। এই বরাদ্দ আসলে সরকারের মানসিকতাকেই বোঝায়। ১০০ দিনের কাজের মত মিড ডে মিল প্রকল্পটাকেই দায়সারা ফালতু খরচ মনে করে সরকার। তাই আদালতের চাপে যতটুকু না-দিলেই নয়, ততটুকু দিয়ে দায় সারে। পারলে সরকার, এই মুহূর্তে বন্ধ করে দিত। যে সমাজ যে সরকার দেশের কোটি কোটি শিশুকে অভুক্ত রাখে অপুষ্ট রাখে সেই সরকার কি সুস্থ সরকার হতে পারে? সে সমাজ কি সুস্থ সমাজ হতে পারে ?

প্রসঙ্গতঃ মিড ডে মিলের খাবারের খরচ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার, কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ দেয় রাজ্য সরকার। মোট খরচের ৬০ শতাংশ কেন্দ্রের, ৪০ শতাংশ রাজ্যের। আলোচনায় উঠে এলো রান্নার জলের সমস্যা, জ্বালানির সমস্যার কথা। বহু ক্ষেত্রেই দূর দূরান্ত থেকে জল টেনে আনতে হয় রান্নার দিদিদেরই। এত জল টানতে কোমর বেঁকে গেলেও উপায় নেই। একটা গ্যাসে মাস চালানোর সমস্যার কথা, এলো

লাকড়ির সমস্যা, কাঠের জ্বালানি দিয়ে এত এত ছেলে-মেয়েদের রান্না করার কষ্টের কথা। এবং সর্বোপরি স্কুল পরিচালন সমিতি, মাস্টারমশাই-দিদিমণিদের অসহযোগিতা বা অসম্মানজনক আচরণের কথা। অর্থনীতি বহির্ভূত নিপীড়নের জ্বালা যে কি ভয়ঙ্কর হতে পারে তার এক এক ঝলক মাঝেমাঝে বেরিয়ে গেল দিদিদের কথায়। বহুজনই বলতে গিয়ে বারবার বললেন, এত কষ্টের মধ্যে দিয়ে কাজ করি কিন্তু তারপরে বলে আমরা না কী চোর! আমরা চোর! পাড়ায় পর্যন্ত রটিয়ে দেয়!

আলোচনায় উঠে এলো অন্যান্য রাজ্যের কথা। জানা গেল, যে রাজ্যের রান্নার কর্মীদের বেতন ভালো সে রাজ্যে খাবারের মানও ভালো। এলো তামিলনাড়ুর কথা। ওখানে মিড ডে মিল কর্মীদের মাসিক বেতন ১৪ হাজার টাকা, বাচ্চাদের খাবারের মান যথেষ্ট ভালো। আর এরাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন? এই প্রশ্ন করলেই মাথা নিচু করে ফেলেন তারা। বলতে চান না। পেশাদারী সমীক্ষকের মতো জনে জনে ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন করতে করতে যা ছবি উঠে এলো তা অবিশ্বাস্য, ভয়ংকর! কুড়ি টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা দৈনিক মজুরি গড়ে। সামান্য কিছু স্কুলে গড়ে ৭০ টাকা। তাও বছরে ১০ মাস পান মজুরি! দু'মাস স্কুল বন্ধ থাকে মজুরিও বন্ধ। সেই মজুরি কবে পাওয়া যাবে তারও কোন স্থিরতা নেই। কাজের কোন স্থায়িত্ব নেই। হেডমাস্টার, নেতা-মন্ত্রীর মর্জির উপর নির্ভর করে কাজ থাকা-না-থাকা। এই মজুরিটুকু পাওয়ারও কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। মাস্টার দিদিমণিদের ফুরসত মতো সে টাকা মঞ্জুর ও জমা হয়।

লকডাউনের মধ্যে যে যাত্রা শুরু হয়েছে, বারাসাতের সম্মেলন পর্যন্ত তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে দিদিরা প্রতিবেদনে লিখেছেন; কী ভাবে রাজনৈতিক ও পঞ্চায়েতের নেতারা হুমকি দিয়েছে, কাজ থেকে তাড়িয়ে দেবে বলেছে! এমন কী ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার কথাও বলেছে। সমস্ত বাধা পার করে সংগঠন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় তাঁরা দেখেছেন; শিক্ষকরা তাদের যেন এখন একটু বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন। সম্মান দিয়ে কথা বলছেন। অনেক অভিভাবকও যেন এত দিনে এই কর্মীদের অস্তিত্বের বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। তাঁরা যে আছেন এটা যেন প্রথম জেনেছেন। খোঁজ নিচ্ছেন কত বেতন, কী কী অন্য সুযোগ সুবিধা পা'ন? কত বেতন পান সেটা লজ্জায় তাঁরা বলতে পারেন না অভিভাবকদের। সম্মেলন থেকে সমস্বরে উঠে এসেছে বাচ্চাদের ভাত আর আলুর ঝোল দিয়ে মাসের পর মাস দুপুরের খাবার তাঁরা আর দিতে পারবেন না। এর পরিবর্তন চাই। শুধু অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নয়, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মিড ডে মিল দিতে হবে। এবং প্রতিদিন একটা করে ডিম অবশ্যই দিতে হবে। আর তাঁদের জন্য স্থায়ী নিয়মিত কর্মচারী হওয়া সাপেক্ষে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দিতে হবে। দিতে হবে অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি। আলোচনায় বারবার উঠে এসেছে মর্যাদার প্রশ্ন। সম্মানের প্রশ্ন। আম্মাদের সংগ্রাম, সংগঠন; কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা বাড়াচ্ছে।

নিজের পরিবারে কেমন আছেন আম্মা'রা? সম্মেলনের দিন বাদুড়িয়ায় একটা স্কুলের একজন আম্মা সদস্যকে নিজ পরিবারেই চূড়ান্ত হেনস্থা হতে হয়। কেন রাত হয়েছে বাড়ি ফিরতে? কোথায় ছিল রাত পর্যন্ত? সেই চিরন্তন প্রশ্ন! মারধোর শুরু হতেই খবর গেল, সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের কাছে। স্থানীয় নেত্রী ওনার বাড়ি গিয়ে পরিবারকে বোঝাবার চেষ্টা করতে তাঁকেও হেনস্থা হ'তে হলো। খবর ছড়িয়ে পড়তেই জড়ো হয়ে গেল আশেপাশের বেশ কিছু মিড-ডে মিল কর্মী। দলবদ্ধ ভাবে সেই পরিবারে যাওয়া, এবং থানায় যাওয়া। শুধু পরিবারটিই নয়, সমগ্র এলাকাই অবাক হয়ে দেখলো; নতুন এক জাগরণ! স্কুল বা বাড়ি, কর্মস্থল বা পরিবার, কোনটিই আর আগের মত থাকবে না।

'এ পরবাসে রবে কে!'

মৌতুলী নাগ সরকার

সুইসাইড নোটে শুধু এটুকুই লিখে রেখেছিল সুপর্না! না, কোনো অভিযোগ সে দায়ের করেনি, জানিয়ে যায়নি আত্মহত্যার কারণও! শুধু রেখে গিয়েছিল একটা প্রশ্ন ..যার উত্তর আমরা আজও দিতে পারিনি, পারব না হয়ত আরো কয়েক দশকে ও। তবে সুপর্নার প্রশ্নের উত্তর হাতড়াতে গিয়ে যে কয়টা বাস্তবতা সামনে আসে তার সূত্র ধরে চেষ্টা করতে পারি মাত্র

যদি তথ্যের কথা ধরি, তাহলে NCRB (National Crime Record Bureau) রিপোর্ট, ২০২১ বলছে পশ্চিমবঙ্গ নারী নির্যাতনে দেশে সবার চাইতে এগিয়ে। ২০২১

এ শুধুমাত্র গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনাই ঘটেছে ১৯,৯৫২ টি (৪৯৮/A , IPC) । আবার UNION HOME MINISTRY রিপোর্ট জানাচ্ছে , পঃবঙ্গে প্রতি এক লাখ মহিলার মধ্যে নারী নির্যাতনের হার ৪১.৫০, যেখানে জাতীয় হার ২০.৫০। আরেকটু পিছিয়ে ২০১৫ সালের রিপোর্ট দেখাচ্ছে যে, পঃ বঙ্গে প্রতি দুইজন মহিলার মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন একজন মহিলা যারা প্রত্যেকেই গৃহবধূ ছিলেন এবং গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়েছিলেন। ঐ বছরে ৫৫৩৭ জন আত্মহননকারী মহিলার মধ্যে ২৯০৮ ই ছিলেন গৃহবধূ। ২০১৫ তে মোট আত্মহত্যা করেন ১৪৬০২ জন মহিলা, যা দেশের মোট আত্মহত্যার ১০.৯ শতাংশ। পাঁচ বছরে অর্থাৎ ২০২০ সালে যে পরিসংখ্যান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২,৩৭২ তে। মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের পরিসংখ্যানের তিন বছরের একটি হিসেব বলছে , ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ এই তিন বছরে যথাক্রমে ২৯৮৫৯, ৩৬৪৩৯ ও ৩৫৮৮৪ টি অভিযোগ জমা পরেছে আমাদের রাজ্যে। ভেবে দেখবেন, এতগুলো ঘটনার অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে, অনথিভুক্ত পরিসংখ্যানটি যে কতটা বড় হতে পারে তার আন্দাজ করা ও মুশকিল! হত্যা হোক বা আত্মহত্যা— উভয়ের পেছনেই যে থাকে শোষণ আর লাঞ্ছনার বাস্তবতা, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা। একদিকে গার্হস্থ্য হিংসা, প্রাতিষ্ঠানিক হিংসা আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে অন্যদিকে দানা পাকে হত্যার ঘটনাগুলো যা মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। তুলে ধরব কিছু এমন অপরাধের ঘটনা।

১) ২০ শে ডিসেম্বর, ২০২১, শিলিগুড়ির মাঝবাড়ি গ্রামের এক গৃহবধূকে পাথর দিয়ে মাথায় মেরে হত্যা করে তার স্বামী ।

২) ২৪/০১/'২২ উঃ বঙ্গে গৃহবধূ রেণুকা খাতুনকে হত্যা করে তার স্বামী মহঃ আনসারুল। খুন করার পর রেণুকার দেহ কে দুই টুকরো করে কেটে ভাসিয়ে দেয় তিস্তা নদীতে। পুলিশি জেরার মুখে আনসারুল স্বীকার করে তার অপরাধের কথা। স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক আছে এই সন্দেহটুকুই আনসারুলের কাছে যথেষ্ট ছিল নিজের স্ত্রীকে হত্যা করতে।৩) নদীয়ার ধানতলায় ২২/০২/'২২ রবীন্দ্রনাথ রায় হত্যা করেন তার স্ত্রীকে। ৪)২০২২ এই ঘটল আরেকটি ঘটনা । স্ত্রী চাকরির পরীক্ষায় বসবেন অথচ স্বামী চাকরি করতে দেবেন না, অত এব এক্ষেত্রে হত্যা না করে ও জীবন্মৃত রাখতে স্ত্রীর ডান হাতটিই এক কোপে কেটে দিল স্বামী। ৫) মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে প্রেমিক সুশান্ত চৌধুরীর হাতে খুন হলেন প্রাক্তন প্রেমিকা সুতপা চৌধুরী (২০)। সুতপা, সুশান্তকে বিয়ে করতে অসম্মত হলে সুশান্ত হত্যা করে তাকে। যুক্তি হিসেবে পুলিশকে সে জানায়, ''সুতপা যদি তার না হয়, তাহলে সে ও সুতপাকে কারোর হতে দেবেনা!'২ সঙ্গী, তা সে প্রেমিকা হোক বা স্ত্রী (অথবা প্রেমিক বা স্বামী)তার ওপর ব্যক্তি মালিকানার যে দম্ভ সুশান্ত তার স্বীকারোক্তি তে জানায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিত আসলে সেখানে ই প্রোথিত । পাশাপাশি উল্লেখ রাখা দরকার, রাজনৈতিক হিংসার শিকার যেভাবে মহিলারা ই হয়ে ওঠেন তার কথা ও। গতবছর, বগটুই এর হত্যার ঘটনা অথবা তুহিনা খাতুনের আত্মহত্যার ঘটনায় আমরা দেখেছি, একই রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব যে হিংসার জন্ম দিল তা হত্যা এবং আত্মহত্যার দিকে চালিত করল মেয়েদেরই। পারিবারিক হিংসা, ব্যক্তি হিংসার পাশাপাশি এই জাতীয় হিংসার চরিত্র আরও বেশি সংগঠিত, ভয়ঙ্কর! যদিও এই ঘটনাগুলোর পরম্পরা নিয়মিত নয় কিন্তু সামাজিক জীবনে মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার প্রকট রূপ ধরা পড়ে এখানে। অন্যদিকে পরিবার ও ব্যক্তি হিংসার ঘটনাগুলো দীর্ঘদিনের চর্চায় গেড়ে বসে পিতৃতান্ত্রিকতার মুল ভিতের ওপর। যার ধীরে ধীরে অনুশীলন হয় একক মহিলার ব্যক্তিজীবনে। তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়। হিংসার চরিত্র আলাদা হলে ও ক্ষত হয় গভীর। আপাতত, এই গার্হস্থ্য হিংসার কারণগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কম বেশি কিছু সাধারণ মানদন্ড আছে। যেমন, ১) পছন্দের অধিকার (অপছন্দেরও) ২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ৩) সম্পর্কে মর্যাদার অসাম্য ৪) মহিলাদের দ্বারাই পিতৃতান্ত্রিকতা অনুশীলন।

১) পছন্দের অধিকার (অপছন্দেরও)— বিবাহ হোক বা প্রেম, আমাদের মতো অসম বিকাশের দেশের (গ্রাম ও শহর নিরপেক্ষ ভাবে) সামাজিক কাঠামোর বহিঃকরনে পুঁজিবাদী/ ঔপনিবেশিক আদলে আধুনিকতা থাকলে ও অন্তঃকরনে থেকে গেছে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ যৌথ সম্পর্কের দায়ভার একটি মেয়ের ওপর দিলেও বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া তার জন্য অন্যায় ও স্বেচ্ছাচার হিসেবে দেখতে শেখায়। এবং মজার কথা এটাই যে, যৌথতা বা বিচ্ছেদে- তার পছন্দ থেকে যায় অনুচ্চারিত! রান্নাঘর থেকে ড্রইং রুমে তার পছন্দ/অপছন্দ উপেক্ষিত থাকে। সন্তানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত এমনকি তার সন্তান ধারণের ইচ্ছে/ অনিচ্ছেও গৌণ থেকে যায়

অনেকক্ষেত্রে। এই গৌণ হয়ে বাঁচা শুধু মেয়েদের নয়, যেকোনো লিঙ্গের মানুষের পক্ষেই অবমাননাকর, অসম্মানজনক। কিন্তু একজন পুরুষকে এই সমাজ ব্যবস্থা যেহেতু মুখ্য স্থানে বসিয়ে রাখে, তাই তার ক্ষেত্রে অবমাননা ঘটে কম। অপরদিকে,একজন মহিলা গৌণতার মানদন্ডে জীবন কাটাতে কাটাতে হীনমন্মতায় ভুগতে শুরু করে, বাধ্যতামূলক বশ্যতা তার আত্মমর্যাদাকে আহত করে ধীরে ধীরে। একটা সময় এই যাপনে অভ্যস্থ হতে হতে সে ভুলে যায় কিশোরীবেলায় কুলের আচারের সে কি স্বাদ! , অথবা কলেজের বন্ধুটিকে দেখতে ইচ্ছে করলে ও তাকে কি ডাকবে একবার? সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুর পূজো করতে বা সবজি ডাল খেতে একদম ইচ্ছে করেনা....সবকিছু ই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় তার কাছে! নিজের বলে কিছু ই থাকেনা যে সমাজে, তা তো পরবাসই বটে! এই প্রসঙ্গে বলি, শারীরিকভাবে নির্যাতিত না হয়েও মর্যাদাহীন জীবন তাকে নির্যাতনের শিকার করে। যদিও আজ পর্যন্ত শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাগুলোই গার্হস্থ্য হিংসা হিসেবে স্বীকৃত হয়, তবে ভেবে দেখার সময় এসেছে, মর্যাদা ও সম্মানের ওপর আঘাত হানছে যে 'গৌণ' থাকার বাধ্যতা- তাও কি নির্যাতন নয়? একজন মানুষ হিংসার শিকার হয়েছেন কিনা তা কি শুধু শারীরিক ক্ষতির নিরিখে বিচার্য হবে? মনের ওপর হিংসার যে আত্মঘাতী প্রভাব পড়ে, তাকে আমরা কবে নির্যাতন হিসেবে স্বীকৃতি দেবো? চেয়েছিলাম উত্তর খুঁজতে কিন্তু প্রশ্নটা ই রাখতে বাধ্য হলাম!

২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা— এক্ষেত্রে একটা ছোট পরিসংখ্যান নেবো। MRIMS (মাল্লা রেড্ডি ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স), স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি জার্নালে (vol 3. issue January-June, 2015) প্রশান্ত আর কোকিয়ার, তার প্রকাশিত নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ২০১৫ তে মাল্লা রেড্ডি ইনস্টিটিউট ও মাল্লা রেড্ডি হসপিটালে কর্মরত ১২৫ জন মহিলার ওপর তারা একমাস ধরে একটি সার্ভে করেন । সেই সার্ভেতে দেখা যায় ৬৯ শতাংস কর্মরত মহিলা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়েছেন। যদিও এক্ষেত্রে ঐ মহিলারা জানিয়েছেন, তাদের প্রতি শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি বরং কটুক্তি, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, দূর্বলতা নিয়ে হাসাহাসি এবং তাদের দূর্বলতা বা কোনরকম অপারদর্শীতাকে ত্রুটি হিসেবে দেখানো ...সাধারণভাবে এই ছিল নির্যাতনের ধরণ। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী বা উপার্জনশীল মহিলারা তাদের ওপর ঘটে যাওয়া নির্যাতনকে মোকাবিলা করতে পারে দুটি উপায়ে, (ক) নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে (খ) বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে। অন্যদিকে যে সমস্ত মহিলা উপার্জন করেন না বা স্বাবলম্বী নন, তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও ঘুরে দাঁড়াতে পারেননা সবসময়। সমাজ, বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা এবং স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে মামলার খরচ জোগানোর অপারগতাই তাকে বাধ্য করে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নিজে উপার্জনশীল না হয়ে নির্যাতনবিরোধী মামলা বা বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রায় অসম্ভব জেনেই সে নিজেই সমঝোতা করে নেয় নিজের সাথে। এমন মেয়েদের সমাজ করুণা দেখায়, কখনও বা তার বিরুদ্ধাচরনকে 'বাড়াবাড়ি' হিসেবে দেখে। ফলত, নির্যাতনই হয়ে ওঠে তার জীবনে স্বাভাবিক। উল্টোদিকে উপার্জনশীল মেয়েরা দেওয়ালে পিঠ ঠেকার আগে একবার অন্তত ঘুরে দাঁড়াতে পারে। নির্যাতন বিরোধী অভিযোগগুলোর পরিসংখ্যানও দেখাচ্ছে উপার্জনশীল মহিলাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করার আনুপাতিক হার বেশি। তাই, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার খোল নলচে পাল্টাতে না পারলেও একটি মেয়ের পছন্দের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে উপার্জনশীল মহিলারা ভালো অবস্থানে আছেন। সামাজিক ব্যঙ্গ , নারী বিদ্বেষী মনোভাবকে উপেক্ষা করেই তারা সম্পর্কের তিক্ততা থেকে বেড়িয়ে আসার সাহস দেখাতে পারেন, সিঙ্গল মাদারহুড এ আছেন , লিভ ইনে আছেন বা সিঙ্গল আছেন এমন ৯৯.৭০ শতাংশ মহিলাই দেখা গেছে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। তাই, যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিটি মেয়ের মেরুদন্ড শক্ত করতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্নে আমরা দেখব হত্যার ঘটনাগুলো। স্বামী বা প্রেমিকের দ্বারা হত্যার ঘটনাগুলো দেখলে বুঝতে পারব, প্রতিটি হত্যার পেছনেই কাজ করেছে পুরুষ সঙ্গীটির রাগ, সন্দেহ, ঈর্ষা। স্ত্রী বা প্রেমিকাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা এবং তা হারানোর আশঙ্কা পুরুষের কাছে পরাজয় হিসেবে দেখা দেয়। সমাজ আর পরিবার তাকে ছোট থেকে যে সর্ব শক্তিমান হিসেবে লালিত হতে শিখিয়েছে, যার ফলে বেচারা পুরুষটির আর শেখা হয়ে ওঠেনি, প্রত্যাখান বা পরাজয় আসলে জীবনেরই অঙ্গ! ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। প্রত্যাখান তার কাছে ব্যর্থতা হয়ে তাকে হত্যার মতো অপরাধে ইন্ধন দেয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি পুরুষের চাইতেও অপরাধী এই

ব্যবস্থা যা অপরাধ করার স্পর্ধা দেয়। এই এক ব্যবস্থা, যা মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে দেখতে শেখায় না, বরং পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে তার চারপাশে দেওয়াল নির্মান করে। উপভোগ্যতার মানদন্ডে নির্ণিত হয় তার গুরুত্ব। সম্পর্কের বাঁধনে যদি এই পশ্চাদপদতা থাকে তাহলে চার দেওয়ালের ব্যক্তি জীবন হোক বা তার বাইরে সামাজিক জীবন , নিরাপত্তাহীনতা সেখানে থাকতে বাধ্য।

৪) মহিলাদের দ্বারাই পিতৃতান্ত্রিকতা অনুশীলন — পুরুষের পিতৃতান্ত্রিকতা চেনা খুব সহজ হলেও অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারা তার অনুশীলন হলে তাকে আলাদা করে চেনা অপেক্ষাকৃত কঠিন। পিতৃতান্ত্রিকতা একটি সংস্কৃতিজাত সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। আমাদের রক্তে মিশে থাকা এই পিতৃতান্ত্রিকতার অনুশীলন যে শুধু পুরুষরা করেন তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই মহিলারা ই তার পরিচর্যা করেন সযত্নে। পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমরা অনেক সময়েই পুরুষদের শত্রু বানিয়ে ফেলি, সচেতন বা অসচেতনভাবে। কিন্তু লড়াইয়ের বর্শামুখ এই ব্যবস্থা না হয়ে পুরুষ হয়ে গেলে মানতে হবে , সেই লড়াইটাও লিঙ্গ বৈষম্যকে মদত দেবে। তাই পিতৃতান্ত্রিকতা বিরোধী প্রতিটা লড়াই য়ে লিঙ্গ নিরপেক্ষ যৌথতা প্রয়োজন। ।

এই প্রসঙ্গ শেষ করা ভালো সূপর্নাকে দিয়ে ই। ১৯৯৯ সালে সূপর্না কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়। ওর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, বাংলা সাহিত্যে দখল ছিল নজর কাড়া। আমাদের পত্রিকার জন্য লেখা চাইতে যখন পরিচয় হল তার সূত্র ধরেই আমার চাইতে দুই বছরের ছোট মেয়েটির সাথে বন্ধুত্ব হতে সময় লাগল না। কথায় কথায় জানতে পারলাম, ওর চাইতে পাঁচ বছরের ছোট ভাইয়ের সমস্ত বিষয়ে টিউশন থাকলেও ওর কলেজের ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত কোনোদিন কোনো টিউশন ছিলনা। মা বা বাবা কেউই প্রয়োজন মনে করেননি। অঙ্কে কাঁচা সূপর্না মাধ্যমিকের সময় অঙ্কের টিউশন চেয়েও পায়নি। বাবা মায়ের যুক্তি ছিল, ''মেয়েমানুষের অঙ্কে ভালো হয়ে লাভ নেই, পাশ করলেই হবে।" তারপর থেকে আর কোনোদিন কিছু চায়নি নিজের বাবা মায়ের কাছে। ওকে আটকানো যদিও দুঃসাধ্য ছিল। কলেজ ডিবেট হোক বা নিবন্ধ লেখা, আবৃত্তি হোক বা কবিতা লেখা ..পড়াশোনার সাথে সাথে সব ক্ষেত্রে ই ফার্স্ট প্রাইজ ওর ই থাকত। কিন্তু রক্ষে কি! প্রফেসরদের প্রিয় ছাত্রী হওয়ার সুবাদে ওর সহপাঠীনিদের মধ্যে অনেকেই ওর চরিত্র সংক্রান্ত কিছু সস্তা দোষে দুষ্ট করল ওকে। সেইসব অপমান আর লাঞ্ছনা পেরিয়ে কলেজের প্রায় চারবছর পর বাড়ির অমতে এক খ্রীষ্টান ছেলেকে বিয়ে করলো, ঠিক সেই বছরেই স্কুলে চাকরিও পেলো ও। কিন্তু নতুন পরিবারে এসে ও দেখে ধর্মপালন, চাকরি, পোশাকের ধরন ..সমস্ত বিষয়েই বিবিধ অভিযোগ, আপত্তি জানান ওর শাশুড়ি । মানিয়ে নেবে ঠিক এমনটাই মনে করে প্রথমে মুখ বুজে সহ্য করত। কিন্তু মানিয়ে নেওয়ার সীমা অতিক্রম করলে ও ওর সঙ্গী মাইকেলকে সমস্যার কথা জানায়। সেইবার মাইকেলের পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে ''এ বাড়িতে থাকতে গেলে মায়ের কথামতোই চলতে হবে!" এরপরই ওর নিস্তব্ধ ভেঙে পড়া দেখেছি। বহুবার বলেছিলাম ঐ তিক্ততা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের শর্তে বাঁচতে। পারেনি ও। অথবা চায় ই নি হয়ত! ৫২ টা ঘুমের ওষুধ খেয়ে সুর্পনা ছুটি নিয়েছিল এই পরবাস থেকে। ও আর নেই জেনে যখন দৌঁড়ে গেছি ওর কাছে দেখেছিলাম এক মুখ ক্লান্তি নিয়ে ওকে ঘুমোতে। নিজের সাথে নিজের এক অসম লড়াই ওকে যেন ক্লান্ত করেছিল খুব। এই ক্লান্তিই মানুষকে অবসন্ন করে,জীবনের প্রতি, (যদিও তা হিংসা হিসেবে স্বীকৃতি পায়না আইনের চোখে)। মাইকেল পাগলের মতো সুইসাইড নোটটা দেখিয়ে বোঝাতে চাইছিল ''ওর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়!" প্রতিবেশীরা বলছিল, ও নাকি খুব ভীতু! বোকা!

হয়ত সুপর্না সত্যিই ভীতু ছিল । কিন্তু পাশাপাশি এটাও তো সত্যি যে, একটা ভয়হীন সমাজে বাস করার অধিকারও ওর ছিল! আমরা সমস্ত 'সাহসী' মেয়েরাও তো পারিনি সেই সমাজ গড়ে তুলতে!

নারী দিবস নারী মুক্তি নারী প্রগতি

শাহানারা খাতুন

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এখনো এ বিষয়ে লিখতে হচ্ছে বলে নারী হিসেবে লজ্জিত হচ্ছি। লজ্জিত হচ্ছি, এই ভেবে যে সমাজ -সভ্যতার বিকাশের চূড়ান্ত শীর্ষে দাঁড়িয়ে , নিজেদেরকে অতি অতি অতি আধুনিক/ সভ্য ভেবেও নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশেষ মর্যাদা প্রদানের জন্য একটা বিশেষ দিন ঘোষণা করা হচ্ছে বলে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভাবে নারীকে

সাফল্য অর্জনের সুযোগ এনে দেওয়ার জন্য নারী দিবস নামক উৎসবের সূচনা করা হচ্ছে বলে। আসলে যখনই একটা বিষয় নিয়ে বিশেষ দিন ঘোষণা করা হয়; তখন বুঝতে হবে সে বিষয়ে জনমানসে যথেষ্ট সচেতনতার অভাব আছে। কিংবা পরোক্ষে দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে মানুষকে অচেতন করে রাখা হয়েছে। তার ভাবনার পরিসরটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নারী দিবস পালন একই সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক/ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটা ছল, অন্যদিকে সেই ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে নারী স্বাতন্ত্রের জয়গান।

সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আদিম সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মায়েরাই ছিলেন সমাজের প্রধান। ঠিক কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থা সে সময় প্রচলিত ছিল, তার সম্পূর্ণ হদিস পাওয়া না গেলেও নারীরাই সমাজের কেন্দ্রে বিরাজমান ছিলেন। যে যাযাবর সমাজ থেকে পরিবারের উৎপত্তি বলে ধরা হয় সেখানেও নারী ছিল গোষ্ঠীর কেন্দ্রে। সেই যাযাবর সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা গত পার্থক্য থাকলেও নারীর প্রতি বিশেষ লাঞ্ছনা,পীড়ন ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যৌন সম্পর্কের কোন সামাজিক নীতির অনুশাসনে নিষিদ্ধ ছিল না। তাই অনিশ্চিত পিতৃপরিচয়ের মধ্যে মাতাই ছিলেন সন্তানের পরিচয়ের কেন্দ্রে। কিছু কাল পরে এই প্রথার পরিবর্তন ঘটলেও নারীই গোষ্ঠীর কেন্দ্রভূমিতে বিরাজ করতেন। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল সমাজ অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে। আদিম যাযাবর খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদক হলো। বন্য পশুকে বশ মানাতে শিখল। ধাতু আবিষ্কার করলো। কৃষি সরঞ্জাম হিসেবে লাঙলের ব্যবহার করতে শিখলো। এই কাজে গভীর শ্রম লাগত। নারী দৈহিক দূর্বলতার কারণে বা সন্তান ধারণ এবং লালন পালনে বহু সময় চলে যাওয়ার কারণে এই উৎপাদনী ব্যবস্থা থেকে সরে গেল। তার উপর কৃষি উদ্ভবের পর আর আগের মতো ঘুরে বেড়াতে হলো না বা স্থায়ী সম্পদ সংরক্ষণের জন্য এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো গেল না। সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্য গোষ্ঠীকে আক্রমণ ও প্রতিরোধের জন্য পুরুষের বাহুবল প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো। বাড়তে লাগলো পুরুষের আধিপত্য। পরাজিত গোষ্ঠীর পুরুষদের দাস বানানো হলো। জমি দখল করা হলো। নারীদের অধিকার করা হলো। গোষ্ঠী আক্রমণে নেতৃত্ব দেওয়া পুরুষ তার সম্পত্তিতে নিজের সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। মাতৃ অধিকার অনুযায়ী বংশ ধারা প্রচলিত থাকায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এই ধারা ভাঙা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। ব্যক্তিগত সম্পদের উদ্ভবের ফলে নারীর অধিকার লুপ্ত হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই আদিম সমাজ ব্যবস্থায় কৃষি উদ্ভবের পর নারী ও জমিকে প্রকৃতির শক্তি হিসেবে মনে করা হত। নারীকে মর্যাদা দেওয়া হত। যা থেকেই great mother goddess বা মহাদেবীর ধারণা। কালক্রমে সম্পদ আহরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিতে জৈব বাধ্যবাধকতার কারণে নারীর ভূমিকা ক্রমশঃ গৌণ হয়ে পড়ে। আর তা থেকেই নারীর অধিকার খর্বিত হয়। তারপর ভলগা, গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, রাইন, টেমস, নীল নদ বেয়ে কত জল বয়ে গেল। দেশে দেশে নদীতীরে কত শহর, নগর, বন্দর,সভ্যতা গড়ে উঠলো। নারী ক্রমশঃ অন্তঃপুরচারিণী হয়ে উঠলো।

কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সকল দেশেই নারীর মর্যাদা লঘু করে দেখা হলো। কোনো প্রাচীন সভ্যতাতেই নারী সম্মানীয় স্থানে ছিল না। সামন্ত সমাজেও নারী ছিল পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সামন্ত সমাজের শিভ্যালরি প্রথা হয়তো নারীর মর্যাদাকে কিছুটা সহনীয় করেছিল। কিন্তু পরোক্ষে তা ছিল নারীকে দূর্বল ভেবে শৌর্য, বীর্য জাহির করা। যেমন আদিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠার পিছনেও ছিল পুরুষ শক্তির প্রাধান্যের ইতিহাস। আমার লেখার সূচনাতেও আমি তাই বলেছি নারী দিবস পালন আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটা ছল। ''পথে নারী বিবর্জিতা'' আসলে নারীকে সম্মান দিতে না পারা/ না দেওয়ার কৌশল। নারীকে ভোগের বস্তু বা সামগ্রী মনে করা। ফলাও করে বলা হয় ভারতীয় সভ্যতায় / বৈদিক আর্য সমাজে নারীর অনেক সম্মান, অধিকার ছিল। একথা সত্য আর্য সমাজে অনেক বিদুষী নারী ছিলেন। অনেক দেবীও ছিলেন।আর্য অনার্য যুদ্ধে অনেক নারী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার মানে এই নয় সমাজে নারীর স্থান খুব উচ্চে ছিল। উচ্চবর্ণের কিছু নারী সীমিত পড়াশোনার সুযোগ পেলেও জনজীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারতো না। আর্য সমাজ পুরুষতান্ত্রিক ছিল। নারীকে পণ্য বা বস্তু সামগ্রী হিসাবে ধরা হতো। ভয় দেখিয়ে বা বেত্রাঘাত করে নারীকে বশীভূত করে রাখা হতো। পুত্র আশির্বাদ, কন্যা অভিশাপ-এ ধারণা পোষণ করা হত। উদাহরণ ভুরিভুরি। মনুসংহিতার কথা আমরা জানি। নারীকে হেয় করার বিধান। ভারতীয় সমাজে জোর্তিবিদ বিদুষী নারীর জিভ কেটে

নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ফ্রান্সে জোয়ান অব আর্ক-কে পুরিয়ে মারা হচ্ছে ডাইনি সন্দেহে। আসলে সমাজ এবং সভ্যতায় নারী যখনই মাথা তুলতে চেয়েছে তখনই তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীবাদী ভাবধারার জন্ম এখান থেকেই।

আজকের নারী মুক্তি, নারী আন্দোলন, নারী প্রগতি দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস। কোন্ সমাজ কত উন্নত নারীর অবস্থান দেখে আন্দাজ করা যায়। সমাজকে উন্নত করতে হলে পরিবারকে উন্নত করতে হয়। আর পরিবারের উন্নতির পিছনে থাকে নারীর ভূমিকা। নারী আন্দোলনের সূত্রপাত ফরাসি দেশে। ১৬৬২খ্রীস্টাব্দে লেখা মার্গারেট লুকাসের 'Female Oretions' প্রবন্ধ নারী আন্দোলনের প্রথম দলিল। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও সৈভ্রাতৃত্বের বাণী সকলের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য হবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সের ওলিম্প দ্য গুঁজে 'নারীর অধিকার ঘোষণা'র কথা বলেছিলেন। নারীর অধিকার আদায়ে তাঁর প্রতিবাদের ফলস্বরূপ তাঁকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। ১৭৯১ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের মেরী ওলস্টোনক্রাফট রচনা করেন নারী অধিকার বিষয়ক এক বৈপ্লবিক গ্রন্থ, "Vindication Of The Rights Of Women"। ঈশ্বর নারীকে পুরুষের চেয়ে হীন করে সৃষ্টি করেছেন এই বদ্ধমূল ধারণায় তিনি আঘাত করেন। তিনি বলেন নারী প্রাকৃতিক ভাবে হীন নয়। সমাজ তাকে হীন করেছে। তাঁর এই গ্রন্থ পাশ্চাত্য নারীবাদী দর্শনের সূচক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের মুষ্টিমেয় কিছু নারী শিক্ষা, আইনগত অধিকার বিশেষত বিবাহ সম্পর্কিত আইন, চাকরি ও ভোটাধিকারের জন্য সোচ্চার হয়। এই সময়কালেই শিল্পবিপ্লব ঘটে গেল। নারী গৃহস্থালি ছেড়ে উৎপাদন কর্মে অংশগ্রহণ করলো। নারী শ্রমিক মজুরি বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে ' শিল্প শ্রমিক সংঘ'। ১৮৪৭ খ্রীঃ ৮ মার্চ আমেরিকার বস্ত্র শিল্পের নারী শ্রমিকরা মজুরি বৈষম্য কর্মঘন্টা ও অমানবিক কাজের পরিবেশের (১৬ ঘন্টা কাজের পরিবর্তে ১০ ঘন্টা কাজের দাবিতে) বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। ১৯০৯ খ্রীঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি জার্মান রাজনীতিবিদ ক্লারা জেটকিন প্রথম নারী সম্মেলন করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ মার্চ শিকাগো শহরে নারী শ্রমিকরা বিশাল বিক্ষোভ মিছিল করে। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ টি দেশের ১০০ জন নারী প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। এই সম্মেলনেই ৮ মার্চ কে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ৮ মার্চ সম অধিকার দিবস হিসেবে পালিত হবে। বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রবাদীরা এই দিবস পালনে এগিয়ে আসে। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকটি দেশে পালিত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে জাতিসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়।

তাহলে কি দেখা গেল? নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, নারী অধিকার, স্বীকৃতি আদায় করতে চলে গেল কত কত বছর। আমাদের নারী শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে এলেন সাবিত্রী বাই, ফুলে, ফতিমা শেখ এর মতো নারীরা। এলেন বেগম রোকেয়া। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সফল ডাক্তার হলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিলেন বীণা, কল্পনা, প্রীতিলতারা। ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। কতশত বীর নারী কত বিপ্লব, সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন। কত শত পদাধিকারী হলেন। রাষ্ট্রপতি হলেন, প্রধানমন্ত্রী হলেন, মুখ্যমন্ত্রী হলেন। লড়াইয়ের ময়দানে এখনও কতশত নারী। তবুও কি নারীর স্বাধীকার প্রতিষ্ঠিত হলো? নারী কি পূর্ণ মর্যাদা পেল? না, প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতোই রয়ে গেল নারীর জীবন? নারী প্রগতি কি পূর্ণতা পেয়েছে? পেলে , এখনও দিবস পালন কেন? প্রশ্ন রয়েই যায়। প্রশ্ন রয়ে যায় একারণেই এখনও নারী স্ত্রী, মাতা, কন্যা। আপন পরিচয়ে পরিচিত নয়। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। ব্যতিক্রম তো নিয়ম নয়। কীভাবে ঘটবে পূর্ণাঙ্গ নারী মুক্তি? অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনে? না সাংস্কৃতিক বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবে? ক্ষমতার কেন্দ্রমূলে যতদিন পুরুষ আধিপত্যবাদ থাকবে ততদিন কি পূর্ণাঙ্গ নারী মুক্তি ঘটবে? সব নারী কি বেরিয়ে আসতে পারছেন অবরোধ ছেড়ে? জড়তার খোলস ছেড়ে? যতদিন না পারবেন ততদিন সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন নারী দিবসের। তবে,

এক দিবসে নারীর মুক্তি
হয় কি বলো আর?
জন্ম ইস্তক দেহে মনে
ধর্ষিতা বারংবার।

সিডিআরও : মানবিধিকার দিবস উদযাপন

কোঅর্ডিনেশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস এর (সিডি আরও) উদ্যোগে গত ১০ ই ডিসেম্ব্ ২০২২, দিল্লির যন্তর মন্তরে পালিত হল সর্বজনীন মানবাধিকার দিবস। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি এই উদ্যোগে উপস্থিত হয়েছিল। সারাদিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি চলেছিল। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের সর্বজনীন ধারণা তুলে ধরেন বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে।

অপরাধী শনাক্তকরণ বিল, মিথ্যা মামলায় আটক, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি উঠে। ওঠে ভীম করে গাও মামলায় অভিযুক্তদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, বর্তমান সরকারের ঘৃণা'র রাজনীতির বিরুদ্ধে জমায়েত থেকে স্লোগান ওঠে; প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। সি ডি আর ও'র সাথে যুক্ত সংগঠন গুলির মধ্যে উপস্থিত ছিল, এপিডিআর পশ্চিমবঙ্গ, এ এফ ডি আর পাঞ্জাব, সিএলসি অন্ধ্রপ্রদেশ, সিপিডিআর তামিলনাড়ু, পিইউডিআর দিল্লি সহ অন্যান্য সংগঠন।

দিল্লী যন্তর মন্তর-এর অবস্থানে এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন, জয়শ্রী পাল। তুলে ধরেনঃ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বন্দিদের বিচারহীনতা ও দুরবস্থার কথা। সংশোধনাগার গুলির নারকীয় চেহারা, বিনা চিকিৎসায় সংশোধনাগারে রাজনৈতিক বন্দিদের মৃত্যুর ঘটনাগুলি। এপিডিআর কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক বন্দিরা' শীর্ষক পুস্তিকাটি ওই জমায়েতের বিল করা হয়। জ্ঞানেশ্বরী কেস এবং শিলদা কেসে, ২০১০ ও ২০১১ সালে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু ১২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এঁদের বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে পারে নি সরকার।

এপিডিআর : কেন্দ্রিয় কর্মসূচি

যত দিন যাচ্ছে ক্ষমতাসীন শাসকরা তাঁদের ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সংবিধান স্বীকৃত যাবতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কে অগ্রাহ্য করে সাধারণ মানুষের ওপর জোর-জুলুম নামিয়ে আনছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে যেকোন আন্দোলনকে শুরুতেই বিনাশ করতে তাঁদের হিংস্র জনবিরোধী রূপ প্রকাশ করে ফেলছে। জনগণের কল্যাণ করবার চাইতে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে তাদের অর্থে পুষ্ট হয়ে নিজেদের দলকে নিয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগের নেশায় মেতে উঠেছে। অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সারাদেশে অন্যান্য গণ-আন্দোলনের কর্মীদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে দেশবিরোধী বলে প্রচার করছে কর্পোরেট মিডিয়ার সহযোগিতায়।

এই পরিস্থিতিতে, স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সংগঠন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)-এর উপর এসে পড়েছে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার অতিরিক্ত দায়িত্ব। বিভিন্ন পথসভা ও প্রশাসনিক স্তরে ডেপুটেশন দেওয়া ও গণ আন্দোলনের সাথীদের ও সাধারণ মানুষকে সংহত করে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা করে সচেতন করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহিত হচ্ছে।

বিগত দিনগুলোর মতো আমরা নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছি জনগণকে সচেতন করতে যা আপনারা বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ মৌলালির মোড়ে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরির পদপ্রার্থী শিক্ষকদের বঞ্চনা ও তাঁদের অধিকার অগ্রাহ্য করবার প্রতিবাদে, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি-স্বজনপোষন ও রাজনৈতিক খবরদারির বিরুদ্ধে, নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার, আন্দোলনরত শিক্ষক পদপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ও সমস্ত ন্যায় সঙ্গত দাবির সমর্থনে একটি অবস্থান-সভা করা হয়। সেই সভায় আন্দোলনরত বিভিন্ন পদপ্রার্থীরা ছাড়াও অন্যান্য গণ সংগঠনের কর্মীরা সমর্থন জানিয়ে তাদের বক্তব্য রাখেন।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২, রাষ্ট্রের দ্বারা পিএফআই ও সহযোগী আটটি দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বিরুদ্ধে; ভিন্নমতের অধিকারের সমর্থনে, শিয়ালদহ রাজাবাজার অঞ্চলে একটি প্রতিবাদ সভার কথা পুলিশকে জানানো স্বত্ত্বেও কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই সভাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী হাজির হয়ে সভার মঞ্চ তৈরিতে বাধা দেয়; ও 'মাইকম্যান'কে ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় বসিয়ে রাখে। সভার ক্ষেত্রে কোনও আইনি বৈধতার উপযুক্ত কারণ ছাড়াই উপস্থিত কর্মীদের ধরপাকড় করে আমহার্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ। এই খবর, অন্য সদস্যদের যথাসম্ভব শীঘ্র প্রচার করে দেওয়ার ফলে অন্যরা সতর্ক হয়ে যান। ঐ সভাস্থল থেকে প্রথমে তিনজন ও পরে আরও দুজনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় বসিয়ে রাখে।

থানার আইসিকে সভা না-করতে দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে বলেন; উপরতলার নির্দেশ। পরে সংগঠনের তরফ থেকে এই বেআইনী গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে নালিশ জানানো হয় ও তারা পুলিশের কাছে এ বিষয়ে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠায়। পুলিশের তরফ থেকে কোনো সদুত্তর না পাওয়ায় এখনও বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে।

এরপর ১৩ অক্টোবর ২০২২, রাজাবাজারে বেআইনিভাবে সভা ভঙ্গ করা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আবার পুলিশকে ঐ সভা করবার কথা জানানো হয়। ঐদিন সভা শুরুর মাত্র একঘন্টা আগে ফোনে জানানো হয় যে ঐস্থানে কোনো সভা করা যাবেনা। সেদিনও রাজাবাজারে বিশাল পুলিশবাহিনী প্রিজন ভ্যান ও জিপ নিয়ে হাজির হয় সভা বানচাল করতে। পুলিশের কাছে সাধারণ সম্পাদক জানান যে গতবারের মতো যেন এবার একজনকেও গ্রেপ্তার না করা হয় কারণ এই সামান্য সময়ে সদস্যদের কাছে সভা বাতিলের বার্তা পৌঁছানো সম্ভব নয়। সেদিন যারা সভাস্থলে পৌঁছান তাঁদের আর পুলিশ গ্রেফতার না-করে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়।

২১ অক্টোবর ২০২২, অনশনরত চাকরিপ্রার্থীদের ওপর মধ্যরাতে পুলিশের হানা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যাদবপুর কফি হাউসের সামনে একটি প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করা হয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগ থাকা সত্ত্বেও মিছিল করা হয়।

১০ নভেম্বর ২০২২ নিষিদ্ধকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে জনমত সংঘঠিত করতে মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি গণ কনভেনশন এর আয়োজন করে সংগঠন। বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্ব স্থানীয়রা সভায় তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। পুণরায় এই ধরণের সভা আয়োজন করবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন বিভিন্ন বক্তা।

২৬ নভেম্বর ২০২২, ভারত সভা হলে আয়োজন করা হয় বার্ষিক কপিল ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতার। ক্ষুহিন্দুত্ববাদ-এর সময়কালে বিচার ব্যবস্থাক্ষু বিষয়ে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মিহির দেশাই। তাঁর নিকট আত্মীয়বিয়োগের কারণে ঐদিনের সভা বাতিল করতে হয়।

১০ ডিসেম্বর ২০২২, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে হাজরা মোড়ে সারাদিন বক্তৃতা, গান ও আবৃত্তি সহযোগে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। মানবাধিকার এর বিভিন্ন বিষয়গুলি উঠে আসে বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতায়।

১৩ ডিসেম্বর ২০২২ সিবিআই হেফাজতে বন্দীকে হত্যা করার প্রতিবাদে সিবিআই দফতরে মিছিল ও ডেপুটেশন দিতে সদস্যরা জড়ো হয় এক্সাইড এর কাছে। রাজ্য পুলিশের বারংবার বাধা দেওয়া স্বত্ত্বেও অবশেষে ডেপুটেশন দিতে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয় রাজ্য পুলিশ। ব্যাপক সংখ্যায় মিডিয়া হাজির হওয়ায় ডেপুটেশন নিয়ে সিবিআই এর কর্তৃপক্ষ জানায় কোলকাতার অফিসটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে কাজ করে রাজ্যের বাইরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সংগঠনের দাবি পৌঁছে দেওয়া হবে।

২৯ জানুয়ারি ২০২৩, সকালে কলকাতা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চেয়ে বক্তব্য রাখেন মিহির দেশাই। পরে মহাবোধি সোসাইটি হলের সভায় ভীমা কোরেগাঁও, তিস্তা শেতলবাদ, উমর খালিদ সিদ্দিকী কাপ্পান প্রভৃতি মামলার আলোকে আলোচনা করেন, ক্ষুহিন্দুত্ববাদ-এর সময়কালে বিচার ব্যবস্থারক্ষু রূপ। উৎসাহি বহু শ্রোতা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

৩০ জানুয়ারি ২০২৩, কলেজ স্ট্রিট মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের সামনে পথসভায় আইএসফের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ওপর পুলিশি জুলুম অত্যাচার ও বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী সহ আইএসএফ কর্মী, গণ-আন্দোলনের কর্মীদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সভা করে সংগঠন।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, কলকাতা পুস্তক মেলায় ছত্তিশগড়ে বাঁচার অধিকারের দাবিতে আন্দোলনরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর রাষ্ট্রের আকাশপথে বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মিছিল করলে মেলার নিরাপত্তা রক্ষীরা মিছিলকারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ও পুলিশ কিছুটা দূর যাওয়ার পর মিছিলের গতি রুদ্ধ করে। মিছিলের গন্তব্যস্থল লিটিল ম্যাগাজিন এর এলাকায় পৌঁছাতে দিতে অস্বীকার করে ও মেলা থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। পুলিশের সঙ্গে বাদ-বিতন্ডা করে সংগঠনের স্টল মেলা প্রাঙ্গণে ফিরে আসে উপস্থিত সদস্যরা।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, আদানির স্বার্থে রাজ্য প্রশাসনের ফরাক্কার কৃষকদের রুজি-রুটির অধিকার অগ্রাহ্য করে

কৃষকদের ওপর যে অত্যাচার করছে, কৃষকদের জমির ওপর দিয়ে ৪ লক্ষ ভোল্টের হাই-টেনশন লাইন বসানোর প্রকল্প বাতিলের দাবিতে ও আন্দোলনের সমর্থনে এপিডিআর বিক্ষোভ- অবস্থানের আয়োজন করে, হাজরার মোড়ে। বহু আগে জানানো স্বত্ত্বেও ঐদিন সকালে ডেকরেটরকে বাঁধা দিলে; থানায় ফোন করলে পুলিশ জানায়, লালবাজারের নির্দেশে সভা নিষিদ্ধ করা হলো। এক্ষেত্রেও ডেকরেটর ও মাইকম্যানকে গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়ে সভা বাতিল করে। সাধারণ সম্পাদক লালবাজারে ফোন করে কোন যোগাযোগ করতে পারেনি। হাজরার সভা বাতিল করতে বাধ্য হয় সংগঠন। পরে প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর সদস্যরা এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস এলাকায় রাণুচ্ছায়া মঞ্চে ফারাক্কার কৃষকদের উপস্থিতিতে অবস্থান-বিক্ষোভ করে। বিভিন্ন সাংবাদিকদের কাছে সরকারের এই অগণতান্ত্রিক আচরণের কথা জানানো হয়।

''ভাষার আধিপত্যবাদ-খর্বিত মাতৃভাষার অধিকার'' বিষয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দীপঙ্কর চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পি, প্রাবন্ধিক,গবেষক। আলোচনা চক্রে তাদের মতামত জানান, যা আগামীদিনে ''ভাষার আধিপত্যবাদ-খর্বিত মাতৃভাষার অধিকার'' সংক্রান্ত বিষয়ে সংগঠনের বিচার্য্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

সিএলসি অন্ধ্রপ্রদেশ-সিএলসি তেলেঙ্গনা : সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

উত্তর উপনিবেশিক ভারতবর্ষে নাগরিক অধিকার রক্ষার যে সংগঠন গুলির নিরলস ও ধারাবাহিকভাবে কাজ করে গেছেন তার মধ্যে অন্যতম সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সিভিল লিবার্টিস্ কমিটি, অন্ধ্রপ্রদেশ ইউনিয়ন অফ সিভিল লিভারটিস, সর্বভারতীয় ইউনিয়ন অফ দিল্লি সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন।

গত ২৫শে জুন, ২০২২, এপিডিআর তার ৫০ বছরের পথচলাকে সামনে রেখে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন করে কলকাতা'র মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অধিকার রক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন এই সভাতে এবং তারা তাদের মূল্যবান বক্তব্যও রাখেন।

পশ্চিমবঙ্গের মতো অন্ধ্রপ্রদেশেও এক ভয়ংকর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের রক্তাতো অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ১৯৭৩ সালে, গড়ে উঠেছিল অন্ধ্রপ্রদেশ সিভিল রাইটস কমিটি। অন্ধ্রপ্রদেশ বিভক্ত হয় তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে। ফলতঃ সিভিল রাইটস কমিটি'র পুনর্বিন্যাস ঘটে, অন্ধ্রপ্রদেশ সিএলসি ও তেলেঙ্গানা সিএলসি। এই দুই রাজ্যের মধ্যে যুক্ত সমন্বয় কমিটি রয়েছে। বিভিন্ন কর্মসূচিতে উভয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের যাওয়া-আসা আছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সিএলসি'র এক ঝাঁক প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার আন্দোলনের সামনের সারির নেতৃত্বকে খুন করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও রাষ্ট্রপোষিত গুন্ডাবাহিনীর দ্বারা। রক্তাক্ত হয়েছে অধিকার আন্দোলনের চালচিত্র। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পুরুষোত্তম জাপা লাক্সমা রেড্ডি, নাড়া প্রভাকর রেড্ডি, আজম আলী, ডক্টর রামা নাথাম, গোপী রাজন্যা সহ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

গত ২৪ শে ডিসেম্বর, ২০২২ সালে, সিএলসি অন্ধ্র এবং সিএলসি তেলেঙ্গানা একসাথে তাঁদের সংগঠনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন করলেন। উদযাপিত হ'ল, গুন্টুর শহরের এনজিও কল্যাণাম হলে। সকাল দশটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত দুটি পর্বে এই অনুষ্ঠান চলে। উদ্বোধন করেন ও আব্বা হো রেড্ডি। অধ্যাপক হরগোপালের উদ্বোধনী ভাষণে উঠে আসে ভারতবর্ষের হিংস্র গণতন্ত্রের স্বরূপ। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের উপরে বক্তব্য রাখেন, ছত্রিশগড়ে আদিবাসীদের অধিকার আন্দোলনের অন্যতম মুখ বেলা ভাটিয়া। ওই কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় বেলা ২৩০'টায়। এই পর্বে প্রধান বক্তা ছিলেন, অধ্যাপক আত্মায়নি ভিতবাহি। সিএলসি'র ৫০ বছরের পথচলার সংগ্রামী ইতিহাস তুলে ধরেন ক্রান্তি চৈতন্য, অধ্যাপক জি লাক্সমান ও চিঠি বাবু। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিল এপিডিআর। দুঃখজনক হলেও সত্যি এই মহতী অনুষ্ঠানে এপিডিআর এর একজনও উপস্থিত থকতে পারেননি। যদিও এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে একটি মেসেজ পাঠানো হয়।

এপিডিআর-এর সমস্ত শাখার কাছে রিপোর্ট পাঠানোর আহ্বান রইল।

সুন্দরবনের মানুষদের জীবন জীবিকার সমস্যা নিয়ে এপিডিআর এর সাইকেল মিছিল

সুন্দরবন এলাকার ৯০ শতাংশ মানুষ জঙ্গল ও নদীর ওপর নির্ভরশীল। এই এলাকার মৎস্যজীবী, মৌলে, কাঁকড়া সংগ্রহকারীদের ওপর বনদপ্তরের বনরক্ষী বাহিনী নানাভাবে তাঁদের জীবিকার ওপর ক্রমাগত আক্রমণ করে চলেছে। বিএলসি পাশ দেওয়ার নামে তাঁদের অধিকারকে খর্ব করেছে। তাঁদের নদীতে নামতে বাঁধা দেয়। যাঁ'রা নদীতে নামেন তাঁদের কখনো জাল, সংগৃহীত মাছ, মধু কেড়ে নেয় অথবা তার বিনিময়ে বিপুল অংকের টাকা দাবি করে।

এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মুমূর্ষ দশা ! ভুবনেশ্বরী ও কাঁটামারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নামেই আছে। ডাক্তার-নার্সের দেখা পাওয়াই যায় না। প্রসূতিদেরও চিকিৎসা হয় না। এলাকার মানুষের স্বাস্থ-শিক্ষা, জীবন জীবিকার 'উন্নয়ন' প্রায় স্তব্ধ !

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা ভাগের নামে সুন্দরবনের এই কুলতলী, মৈপিঠ এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা হচ্ছে। জল জঙ্গল জমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এর বিরুদ্ধে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এপিডিআর-এর সাইকেল মিছিল শুরু হয় মৈপিট পয়লা ঘেরি থেকে। শেষ হয় কাঁটামারি হাটে।

আদানির বিরোধীতায় ফারাক্কার কৃষক

আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন, গত প্রায় একবছরের ওপর ধরে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার বেনিয়াগ্রাম অঞ্চলের দাদনটোলা, ঘোলাকান্দি, ইমামনগর, সমসপর, বল্লালপুর (১) ও বল্লালপুর (২) গ্রামের আপামর গ্রামবাসী আদানি কোম্পানির উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন (৪ লক্ষ ভোল্ট) বিদ্যুৎ প্রায় ১০০০ বিঘা আম লিচুর বাগানের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরোধীতা করছেন। আদানি প্রকল্পের এই কাজ গ্রামবাসীদের আপত্তি উপেক্ষা করে প্রায় এক বছরের ওপর ধরে চলছে। এই বাগানের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৫০০০ গ্রামবাসী জীবন জীবিকা থেকে উৎখাত হওয়ার ভয়ে শঙ্কিত। চার লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুতের তার বাগানের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু বছরের পুরাণো সুগঠিত আম লিচুর গাছ কাটা চলছে নির্বিচারে। নিজেরা সংগঠিত হতে গ্রামবাসিরা ২৩শে জুন,২০২২ ছয়টি গ্রামের লোক মিলে একটি গণ কনভেনশন করে 'জমি জীবন জীবিকা প্রকৃতি লুঠ বিরোধী জনগণের কমিটি' গঠন করেন।

গত ২রা জুলাই, ২০২২ এই কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনরত অবস্থানের উপর পুলিশি আক্রমণ সমগ্র এলকাকে স্তব্ধ করে দেয়। গ্রামবাসীরাও সাধ্যমত অবরোধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু পুলিশি আক্রমণে গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ ভেঙে পরে।

জোর-জবরদস্তি করে আদানি পাওয়ার প্ল্যান্টের তার টাঙ্গানোর বিরুদ্ধে, পুলিশি নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে জনগণের কমিটি জুলাই, ২০২২ মাসেই মিছিল করে জেলা শাসককে ডেপুটেশন দেয় ও সাংবাদিক সম্মেলন করে। এরপর সরাসরি পুলিশি সংঘাত এড়িয়ে গ্রামে গ্রামে জনগণের কমিটি ছোট ছোট মিটিং করতে থাকে। অক্টোবর, ২০২২ জনগণের কমিটি ৬টি গ্রামের গ্রামবাসীকে নিয়ে একটি গণকনভেনশন করে। কমিটির কিছু সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান, এপিডিআর এর সাথে মিলে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে হাই কোর্টে কেস ও এলাকায় নানা ধরনের আন্দোলনমুখী কর্মসূচী কনভেনশনে প্রস্তাবিত হয়।

গত ৩১ জানুয়ারি,২০২২ আদানি পাওয়ার প্ল্যান্ট ও এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত বিভাগের বিরুদ্ধে গ্রামবাসী ও এপিডিআর এর করা PIL কলকাতা হাই কোর্টে জমা পরে। সামনে উঠে আসে যে প্রশ্নগুলি ঃ ১) ফারাক্কার কৃষকের সম্মতি না-নিয়ে ১০০০ বিঘা আম লিচুর বাগান ধ্বংস করে ৪ লক্ষ ভোল্টের তার নিয়ে গিয়ে আদানি পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করা। ২) কৃষকের সম্মতির বিরুদ্ধে আদানির কাজ চালিয়ে যাওয়া। ৩) হাই কোর্ট কমিটি করে সরেজমিনে তদন্ত করার বিষয়। ৪) যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ। ৫) প্রতি মাসে জমিদাতাদের জমি ভাড়া দেওয়া। ৫) পরিবেশের চরম ক্ষতি করে ১০০০ বিঘা বাগানের বহু বছরের সুগঠিত গাছ কাটা নিয়ে প্রশ্ন। ৬) গ্রামবাসীদের ওপর পুলিশি নিপীড়ণ। এই সমস্ত কিছুই আজ খবরের শিরণামে।

''ফারাক্কার কৃষকের সম্মতি ছাড়া কোনও ভাবেই ১০০০ বিঘা আম লিচুর বাগান ধ্বংস করে ৪ লক্ষ ভোল্টের হাই টেনশন বিদ্যুতের তার নিয়ে গিয়ে আদানি পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু

করা যাবে না''— এই দাবিতে জনগণের কমিটি ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩, বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হবে। একই সাথে ফারাক্কার বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩, এলাকার বাগানেই জনসভার ঘোষণা করা হয়। থানাকে লিখিতভাবে এই কর্ম্মসূচিগুলির বিষয়ে জানানো হয়।

পরিস্থিতি ঘুরে গেল ১২ই ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যা থেকেই পুলিশ প্রবল হুমকি দেওয়া শুরু করে। কোনও কর্মসূচি করা যাবে না। রাত প্রায় ১১ টার সময় কমিটি'র আহ্বায়কদের ঘরে হাজির হয় একগাড়ি পুলিশ। বলে, আহ্বায়কদের থানায় যেতে হবে। বড়বাবু ফোনে হুমকি দিতে থাকেন, কোন কর্মসূচি করা যাবে না। অথচ, পুলিশকে পদ্ধতিগত নিয়ম মেনে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। কমিটি গণতান্ত্রিকভাবে মিটিং-মিছিলের পথে এগিয়েছিল। তবু, বাঁধা! কোন আইনে করা যাবে না? পুলিশের একটাই উত্তরঃ অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, তাই করা যাবে না। আবারও গ্রামবাসীর প্রশ্ন, মিটিং মিছিলে পুলিশের আলাদা করে আবার অনুমতি লাগবে কেন? এলাকায় তো কোন উত্তেজনা নেই। পুলিশের আবারও একটাই উত্তর, কোন কর্মসূচি করা যাবে না। এটাই শেষ কথা।

১২ তারিখ রাতে সংগঠকরা মিছিল বাতিল করতে রাজি না হওয়ায় ১৩ তারিখ সকাল থেকেই শুরু হয় প্রবল পুলিশি চাপ ও হুমকি। গ্রামে-গ্রামে চলে পুলিশ ভ্যানের টহলদারি। ঘরে-ঘরে গিয়ে হুমকি চলতে থাকে, কেউ মিছিলে যেতে পারবে না। নেতৃস্থানীয়দের থানায় নিয়ে যাওয়ার ক্রমাগত পুলিশি চাপ বাড়তে থাকে। এই চাপ ও হুমকির মুখে আন্দোলনরত চাষীদের সংগঠন জনগণের কমিটি ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৪ তারিখের প্রস্তাবিত বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভা বাতিল করতে বাধ্য হয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারি,২০২২ কলকাতার হাজরার মোড়ে ফারাক্কার কৃষকের সম্মতি ছাড়া কোনভাবেই ৪ লক্ষ ভোল্টের হাই টেনশন বিদ্যুতের তার নিয়ে আদানি পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করার বিরুদ্ধে ও ফারাক্কার ফলচাষিদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর আদানির হয়ে পুলিশি সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে এপিডিআর এর বিক্ষোভ-অবস্থান ঘোষণা করা হয়। সেই কর্মসূচিও বাতিল করতে বাধ্য করে কলকাতা পুলিশ। এরপর, এপিডিআর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে পুলিশকে আর না জানিয়েই কলকাতার রবীন্দ্রসদনের কাছে রানু ছায়া মঞ্চে ১৬ ফেব্রুয়ারী-তেই সারাদিন ধরে বিক্ষোভ অবস্থান পালন করে ও সাংবাদিকদের সামনে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে আসে।

এপিডিআর প্রায় প্রথম থেকেই ফারাক্কার কৃষকের অধিকারের কথা সোচ্চারে বলছে। ২০২২ সালের জুন মাসের শুরুতে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও সামসেরগাঞ্জ শাখা ফারাক্কার ফল চাষিদের ডাকে সারা দিয়ে একটা প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান করে ও সাংবাদিকদের সামনে বিষয়টি নিয়ে আসে। গত ২৩ শে জুন,২০২২ আম লিচুর বাগানে এক বিশাল গণ কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে জমি জীবন জীবিকা প্রকৃতি লুঠ বিরোধী জনগণের কমিটি গঠিতহয়। এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও সামসেরগাঞ্জ শাখা এই কনভেনশনে আমন্ত্রিত ছিল। এরপর, নবগঠিত ফারাক্কার জনগণের কমিটি আন্দোলনের রাশ নিজেদের নেতৃত্বে নেয়। প্রতিদিনই এলাকায় পোস্টারিং, মিটিং, মিছিল, পোস্টারিং ও বাগানেই টানা অবস্থান চলতে থাকে। এলাকায় আদানির টাওয়ারে তার টাঙ্গানোর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ৩০শে জুন ফারাক্কার থানার আইসি'র নেতৃত্বে পুলিশ ৩০০ জনের এক বাহিনী নিয়ে গ্রামবাসীর অবস্থান ভাঙতে আসে। কিন্তু গ্রামবাসীর প্রবল বাঁধায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এরপর আবার ২রা জুলাই প্রায় ৮০০ জনের বাহিনী নিয়ে পুলিশ তান্ডব চালায়। গ্রামবাসীরাও নিজস্ব ক্ষমতায় প্রতিরোধ করে। কিন্তু অপ্রস্তুত গ্রামবাসীর প্রতিরোধ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত পুলিশি তান্ডবে ভেঙে যায়। তারপর দুদিন ধরে ব্যাপক পুলিশি পাহাড়ায় দিনরাত এক করে আদানি কম্পানির লোকেরা টাওয়ারে তার টাঙায়। সমস্ত সংবাদ মাধ্যমেই পুলিশি নিপীড়নের ঘটনা উঠে আসে।

গ্রামবাসীরা এপিডিআর-কে সমস্ত বিষয়টি জানায়। এপিডিআর কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলী, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও সামসেরগাঞ্জ শাখাকে সাথে নিয়ে ১৩ জনের একটি টিম তথ্যানুসন্ধানে আসে। তথ্যানুসন্ধানের পর এপিডিআর কলকাতা, বহরমপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় ফারাক্কার কৃষকদের ওপর পুলিশি নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং, পোস্টারিং করতে থাকে। সংবাদ মাধ্যমে সমস্ত বিষয়টা নিয়ে আসে ও একটি তথ্যসমৃদ্ধ তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট প্রকাশ করে। তথ্য জানার অধিকার আইনে এপিডিআর রাজ্য সরকারের জমি বিভাগের কাছে জানতে চায় যে, আদানি পাওয়ার প্ল্যান্টের সাথে ফারাক্কার বেনিয়াগ্রাম অঞ্চলের ১০০০ বিঘা আম-লিচুর বাগান দেওয়া নিয়ে বা পশ্চিমবাংলার জমি দেওয়া নিয়ে কোনও রকম চুক্তি

হয়েছে কি না? রাজ্য সরকার জানিয়েছে, কোন চুক্তি হয়নি। এরপরই এপিডিআর ও গ্রামবাসী মিলে কলকাতা হাই কোর্টে PIL করে, যা আজ ভারত বাংলাদেশ, সকলেরই চর্চা'র বিষয়।

কৃষকদের ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে পুরো বিষয়টার মধ্যে চালবাজী বা কৌশলের গন্ধ রয়েছে। প্রথমে টেলিফোন টাওয়ারের মত ইলেকট্রিক টাওয়ার হবে বলে গ্রামবাসীদের কাছে আদানির লোকেরা জমি চায়। গ্রামবাসীরাও সরল বিশ্বাসে জমি দিতে রাজি হয়। যারা জমি দিতে রাজি হয়, তাদের হিন্দিতে একটি কাগজ দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা সেটা পড়ে কিছুই বোঝে না। গ্রামবাসীদের সেই কাগজেই সই করিয়ে নেওয়া হয়। এই কাগজটিতে আসলে আদানি পাওয়ার প্ল্যান্ট বিষয়ে কিছু লেখা ছিল। ঐ কাগজেই টাকার অঙ্ক লিখে সই করানো হয়। শুধুমাত্র টাওয়ারের জমির জন্য। জমির দাগ নাম্বার, খতিয়ান নাম্বার সমেত টাকার অঙ্ক লিখে কোন চুক্তিপত্র করা হয়নি।

১০০০ বিঘা আম লিচুর বাগান। তার মধ্যে হাই রোডের কাছ থেকে ধরলে ১০ টি টাওয়ার পরে। টাওয়ার গোটা জমির কম অংশই পূরন করে। জমির ব্যাপক অংশ কভার করছে ৪ লক্ষ ভোল্টের তার। আর এই তার নিয়ে যাওয়ার জন্য কাটা পড়ছে প্রচুর গাছ। এই তারের নিচের জমির কোন ক্ষতিপূরণ নাই। শুধুমাত্র টাওয়ারের জমির জন্য কয়েকজনকে ডিমান্ড ড্রাফট দেওয়া হয়েছে। তা'ও কাঠা প্রতি এক-একজনকে এক-একরকম মূল্য ধরা হয়ছে। দামের কোনও সমতা নেই। পুরোটাই বেআইনি। দেশের ইলেকট্রিসিটি আইন, টেলিগ্রাফ আইন, রাজ্যের নতুন জমি আইন, সদ্য প্রকাশিত তারের নিচের জমির দাম দেওয়ার আইন; সমস্ত বিধি-বদ্ধ নিয়মকে কাঁচকলা দেখিয়ে তার নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঝাড়খন্ডের গোড্ডায় বসেছে আদানি পাওয়ার প্ল্যান্ট। সেখান থেকে তার টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ পর্যন্ত। ২০১১ সালে, মনমোহন সিং সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা নিয়ে এক চুক্তি হয়। কিন্তু এই চুক্তিকে কার্যত রূপদান করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কর্পোরেট হাঙর আদানিকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া হয় ২০১৫ সালে। ঝাড়খন্ডের গোড্ডায় আদানি পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ১০০০ একর জমি থেকে গায়ের জোরে ঝাড়খন্ড পুলিশের সহযোগিতায় আদিবাসী কৃষককে উচ্ছেদ করা হয়। কৃষকদের সমস্ত প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। জমি নেওয়ার জন্য আদানি ঝাড়খন্ড সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি করে। জমির প্রশ্নে গোড্ডার কৃষকরা আজও বিরোধীতায় সামিল। গোড্ডায় আদানি পাওয়ার প্ল্যান্টে জল সরবরাহ করা হচ্ছে ঝাড়খন্ডের সাহিবগঞ্জের গঙ্গা থেকে। ১০০০ কিমি পাইপলাইন যাবে মূলত আদিবাসীদের জমির ওপর দিয়ে। গঙ্গা থেকে জল তোলার জন্য ঐসমস্ত গ্রামগুলির ভূগভস্থ জলের স্তর অনেক নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গঙ্গায় জলের স্বাভাবীক প্রবাহে বিঘ্ন দেখা দেবে। তাই ঐসব এলাকার গ্রামবাসীরা সঙ্গবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধে সামিল হয়েছে। প্ল্যান্টে কয়লা আসছে ওড়িশার সুন্দরগড়, রাউরকেল্লা, গাংপুর, রাঁচি হয়ে। কিন্তু সুন্দরগড় এলাকার মানুষরা রেল লাইনের জন্য জমি দেবে না বলেছে। বাংলাদেশের কৃষকরাও জমি দেওয়ার প্রশ্নে বেঁকে বসেছে বলে জানা যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে প্রচুর মুনাফা নিয়ে আদানি হয়ে উঠবে ফুলে ফেঁপে লাল। আর কৃষকরা জল জঙ্গল জমি থেকে হবে উচ্ছেদ! এটা খুব সহজেই হওয়ার নয়।

বাংলার তৃণমূল সরকারের সাথে আদানি পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ফারাক্কার জমি দেওয়া নিয়ে কোন চুক্তি না হলেও রাজ্যের পুলিশ লাঠি ও বন্ধুকের ডগায় ফারাক্কার কৃষক আন্দোলনকে দমন করতে নেমেছে, অধিকার আন্দোলনের কণ্ঠ চেপে ধরেছে, ঠিক সেভাবেই ছত্রিশগড়ের কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় কর্পোরেট হাঙর বিরোধী আদিবাসীদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে হেলিকপ্টার ও ড্রোন থেকে বোম্বিং করছে। দেশের জনগণের ওপর এক যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আদানির বিরোধীতায় সংসদ কাঁপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নানা জায়গায় আদানি বিরোধী মিটিং হচ্ছে। অথচ, আদানি বিরোধীতায় ফারাক্কার কৃষক রুখে দাড়ালে পুলিশের লাঠির ডগায় তাদের ছত্রভঙ্গ করা হচ্ছে। জনগণের কাছেও এই দ্বিচারিতা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। প্রহসন শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। দেশে প্রহসনই এখন নীতি-নিয়ম হয়ে উঠেছে! সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বাংলার জনগণ এখনও ভোলেনি। টাটা ও সালেম কে বাঁচাতে গিয়ে কৃষক আক্রমণের ফল ভোগ করতে হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারকে। আদানিকে বাঁচাতে গিয়ে আজকের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার একই অবশ্যম্ভাবী পথ বেছে নিচ্ছে!

বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ঝাড়খন্ডে। সরবরাহ হবে বাংলাদেশে। আর মাঝখানে বাংলার মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার কৃষকের ১০০০ বিঘা আম লিচুর বাগান হবে ধ্বংস। জীবন

জীবিকা থেকে কৃষকরা হবে উচ্ছেদ। খুব সহজেই ঝাড়খন্ডের গোড্ডায় একটা সুইচ টিপলেই বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ঢুকবে, আর ফারাক্কার কৃষকরা হয়ে পরবে সহায় সম্বলহীন। এই চাপিয়ে দেওয়া অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে খুব স্বাভাবিকভাবেই কৃষকরা লড়বে। চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধে কখনো এগিয়ে, কখনো পিছিয়ে রুখে দাড়াবেই কৃষকরা। আর সমস্ত অধিকার আন্দোলনকারীদের, পরিবেশ আন্দোলনকারীদের, সমস্ত সামাজিক শক্তি ও সংগঠনদের এই চাপিয়ে দেওয়া অসম যুদ্ধে নিজ নিজ ভূমিকা নিয়ে দেশ জাতি ও জনগণের অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের পাশে দাঁড়াতেই হবে।

তথ্যানুসন্ধান: বকখালী জঙ্গলে আগুন

কিছু দৈনিক পত্রিকা ও বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমের খবর ও আরো কিছু সূত্রের মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, বকখালির জঙ্গলে আগুন লেগেছে। এই খবরের অনুসন্ধানে ঙঞ্চঙ্গট্ট কাকদ্বীপ-নামখানা শাখার পক্ষ থেকে আমাদের তিন সদস্যের একটি তথ্যনুসন্ধানী দল গত ১৯ ফেব্রুয়ারি('২৩) রবিবার বকখালির ঘটনাস্থলে যয়।

এই ঘটনার তথ্যনুসন্ধানে প্রথম যাওয়া হয় বকখালি রেঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকারী বিমল মাইতি এবং আরো একজন বনকর্মীর কাছে। এছাড়াও জঙ্গল লাগোয়া এলাকার একাধিক মানুষ ও কিছু প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা হয়। তাঁদের বক্তব্য থেকে যা পাওয়া গেল তা রাখা হলো : এলাকার কিছু মানুষের কথা থেকে জানা যায় যে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ টে নাগাদ জঙ্গলে আগুন লাগার বিষয়টি এলাকার মানুষজনের নজরে আসে। এবং তারা এই ঘটনা ঐ জঙ্গলের একাংশে অবস্থিত বনাধিকারীককে জানান। তবে এই বিষয়টি নিয়ে বকখালি রেঞ্জারের অফিসে তাপ-উত্তাপ খুব একটা দেখা যায়নি। ফলে স্থানীয় মানুষজন নিজেদের উদ্যোগে বালতি করে জল নিয়ে কিছুটা আগুন নেভানোর উদ্যোগ নেয়। তবে তা ছিল ঘটনার ভয়াবহতার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য উদ্যোগ। এর পরে সারা রাতে সেই আগুন জ্বলতে থাকে যা পরের দিন অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত জ্বলে। তবে, অনেক বিলম্বে বন দপ্তর দমকলের সাহায্য চায়, ততক্ষণে জঙ্গলের ৮০ভাগ অংশ পুড়ে যায়! এরপর জঙ্গলে রাস্তা না থাকার জন্য দমকল আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে খুব একটা কিছু করতে পারে নি, বলে জানা যায়।প্রত্যক্ষদর্শী সঙ্গে কথা বলে জানা যায় প্রায় ৩০ একর এলাকার জঙ্গল এই আগুনের কবলে পড়েছে।

আগুন লাগার বিষয়ে এলাকার আরো একটি অংশের অভিমত হলো প্রকৃত পক্ষে আগুন লাগে এই ঘটনার ৮-৯ দিন পূর্বে অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারি। এই আগুন লাগার এলাকা ছিল কালীস্থান, পরে সেই আগুন বিশালাক্ষী মন্দির পর্যন্ত বিস্তীণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

এই কথাটার সত্যতা রয়েছে বলে আমাদের মনে হয়, কারণ এত বিস্তীণ এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার জন্য সময় অনেকটাই লেগেছে। কিন্তু, রেঞ্জার অফিসার কোন কথা বলতে অস্বীকার করেন!

পর্যবেক্ষণ

প্রথমতঃ এই ঘটনা মোটেও একদিন বা দুদিনের নয় বলে আমাদের অনুমান। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জঙ্গলের নাকের ডগায় বনদপ্তরের অফিস এবং ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা থাকা সত্ত্বেও কেন দমকলের আসতে এতোটা দেরি হলো?

দ্বিতীয়তঃ সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছাড়া বকখালি রেঞ্জারের অফিসের নাকের ডগায় এত বড়ো ঘটনা ঘটা অসম্ভব। তৃতীয়তঃ বনদপ্তর ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের মদতছাড়া এই ঘটনা ঘটতেই পারেনা। এই বিষয়ে বকখালির বনাধিকারীকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি মুখ খুলতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। কিন্তু কেন?

আমাদের দাবী

১) অবিলম্বে সম্পূর্ণ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।

২) তদন্তে দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩) পুড়ে যাওয়া এলাকায় নতুনভাবে বনসৃজন করতে হবে।

তথ্যানুসন্ধান দলে ছিলেন–
শংকর দাস, নারায়ণ সামন্ত, চন্দন সিংহ

ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে পকুর ভরাট : পানিহাটি শাখার তথ্যানুসন্ধান

১৯৮৫ সালে চন্ডীতলার ইটখোলার পুকুরটি কালো ছাই (Fly Ash)দিয়ে তদানীন্তন শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ভরাট করে। সেই সময় চন্ডীতলার পরিবেশেপ্রমী মানুষ জলাশয়টি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। ২৮/৯/৯৩ তারিখে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আদালত, ভরাট হওয়া পুকুরটিকে জমি অধিগ্রহণ আইন ১৯৫৫ এর ৪/৪ ধারা অনুসারে খাসজমি হিসেবে ঘোষণা করে।

আজ পর্যন্ত জমিটি সরকারী নথিতে খাসজমি (Vested) হিসেবে চিহ্নিত। বারে বারে এই জমিতে বেআইনি নির্মাণ হওয়াতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR), পানিহাটি শাখা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। হাইকোর্ট ইটখোলার পুকুর রক্ষা করার জন্য এবং ভরাটকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলাশাসক, জেলার প্রধান বিচারপতি ও ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে।

এতদসত্ত্বেও অতি সম্প্রতি এখানে আবার বড়আকারে বেআইনি নির্মাণ শুরু হয়। এপিডিআর পানিহাটি শাখা, প্রশাসনের সর্বস্তরে বিষয়টিকে জানালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরপর দুদিন (২০/২/২৩ এবং ২৭/২/২৩) এসে জমির পরিমাণ সরকারী আমিন কে দিয়ে পরিমাপ করিয়ে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। এই দুই দিনই এপিডিআরের পক্ষ থেকে অকুস্থলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জলাশয় ও জলাভূমি (বছরে তিন মাস জল থাকলে) রক্ষা, ভরাট হয়ে যাওয়া জলাশয়কে পূর্বাবস্হায় ফিরিয়ে দেওয়া ও খাস জমিতে অবৈধ নির্মাণ বন্ধের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করে।

এপিডিআরের দাবি, সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনকে মান্যতা দিয়ে পৌরাঞ্চলে পৌরসভাকে এবং পঞ্চায়েতে জেলাশাসককে জলাশয় ও জলাভূমি রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এপিডিআর-এর মুখপত্র
‘অধিকার’ পড়ুন ও পড়ান

একটি অনুসন্ধানের কাহিনি

বাবু সিংহরায়

আগেই মনে হয়েছিল, যেতে দেবে না। তবু আমরা চেষ্টা করে ছিলাম।

বছরের শুরুতেই বস্তারে বিরাট আক্রমণ! মাওবাদীদের মারার জন্য আকাশ থেকে গুলি চালিয়েছে। বোমাও ফেলেছে কতজন মারা পড়েছে কে জানে! হয়তো একটা-দু'টো গ্রামই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমরা সিডিআরও'র পক্ষ থেকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রাষ্ট্র কি চায় অতবড় কুকীর্তির কথা বাইরের লোক জেনে ফেলুক?

এ-বছর জানুয়ারী মাসের মাঝামঝি খুব শীত! ১৫ জানুয়ারী, ২০২৩, সকলে তাপস চক্রবর্ত্তীর ফোন, মনে হচ্ছে, একবার গীয়ে দেখে আসতে হবে; তৈরি হো'ন, ছত্তিশগড়ে আকাশ থেকে বোম্বিং হয়েছে। তাপস'দা কো অর্ডিনেশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রাইটস অর্গানাইজেশন-এর অন্যতম আহ্বয়ক। এটি আসলে বিভিন্ন প্রদেশের মানবাধিকার সংগঠঙ্গুলির যৌথ মঞ্চ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এপিডিআর তার অংশ।

তাপস'দার কথা শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, যেতে দেবে কী! দেখাই যাক না কী হয়! রাজি হ'ল সন্দীপ সাহা। সে তরুণ, ফটোগ্রাফার। একটি কাগজে চাকরি করে। পাঞ্জাব, দিল্লী, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র থেকেও অনেকে যাবে শুনলাম।

সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেস, ৩০ জানুয়ারী '২৩, রাত দশটা কুড়ি আমাদের যাত্রা শুরু।

ট্রেন জগদলপুর পৌছালো ৩১ জানুয়ারী রাতে। ছোট ষ্টেশন। কিন্তু বেশ সাজানো-গোছানো। আমাদের ষ্টেশনে নিতে এসেছিল মৃন্ময় বারিক। পেশায় সাংবাদিক। মৃন্ময়ের স্কুটারে চেপে যাচ্ছি, রাত তখন সাড়ে-দশ'টা। জগদলপুর শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। সুরেশ পান্ডে নামে একজনের বাড়িতে নিয়ে গেল। রাতে ওখানেই থাকার ব্যবস্থা। আরও একজন এলো। নাম কমল শুক্লা। সে সাংবাদিক। পুলিশ- প্রশাসনে তাঁর খুব জানাশোনা। শুক্লা আমাদের সঙ্গে যাবে। সে প্রথমে বললো সকাল ন'টায় বেরোব, পরে কীভেবে বললো ভোর ছ'টায়। শেষ পর্যন্ত সাড়ে সাতটায় বেরোলাম। প্রথমে, অটোয় জগদলপুর বাস ষ্ট্যান্ড। লাক্সারী বাস আমাদের পৌছে দেবে সুকমায়, সেখান থেকে যাব ভাড়ার গাড়িতে। সেই গাড়িও এক

জায়গায় গিয়ে থেমে যাবে। তারপর হাঁটা পথ। গভীর জঙ্গলে গাড়ি ঢোকে না, রাস্তা নেই।

জগদলপুর থেকে সুকমা তিন-চার ঘন্টার পথ। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়া। শুক্লা সব রাস্তাঘাঠ চেনে। একবার আঙ্গুল দিয়ে জানলার বাইরে দেখাল, ওই জায়গাটা দেখুন, ওইখানে মহেন্দ্র কর্মাকে মেরেছিল। মহেন্দ্র কর্মাকে তাঁর ভক্তরা বলত, 'টাইগার অব বস্তার'। সে গন্ড জাতির এক সর্দারের ছেলে। মাওবাদী দমন অভিযানে খুব নাম করেছিল। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা খুব ড্রামাটিক! ২০১৩ সালের ২৫ মে সে মারা যায়। ওই দিনটি হ'ল 'নকশাল বাড়ি দিবস'। অদ্ভুত সমাপতন!

আমরা বেলা সাড়ে-এগারোটা নাগাদ পৌঁছলাম সুকমায়। রাজ হোটেলে ফ্যাক্টফাইন্ডিং টিমের সকলের মিলিত হলাম। অন্ধ্র থেকে এসেছেন, কুমারস্বামী, চন্দ্রী, তেলেঙ্গনা থেকে এসেছেন প্রফেসর লক্ষণ নারায়ণ রাও। আগে কয়েকবার ফ্যাক্টফাইন্ডিং-এ গিয়ে তাঁদের সাথে দেখা হয়েছে। এবার দিল্লী থেকে একটি ছোট মেয়ে এসেছিল। রাজীব কাউর। এখনও পড়াশুনা করছে। আর ছিলেন বেলা দিদি। বেলা ভাটিয়া।

সুকমায় গিয়ে শুনলাম আরও দু'টি ঘটনায় আমাদের তদন্ত করতে হবে। খুব গুরুতর ঘটনা! ছত্তিশগড়ে আগামী নভেম্বরে ভোট। এখন থেকে বিজেপি ছক কষছে, কীভাবে ক্ষমতায় ফেরা যায়। প্রচার শুরু করে দিয়েছে। ওদের প্রচার মানে দাঙ্গার উস্কানি, সেই সঙ্গে হুজ্জতি। অনেক গ্রাম থেকে খ্রীষ্টানদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

দান্তেওয়াড়া জেলার একটি গ্রামেও যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে দু'বছর ধরে চাষিরা সিআরপি ক্যাম্পের সামনে বসে আছে। তাঁদের দাবি ক্যাম্প সরিয়ে নাও। সিআরপি দূর হটো। আন্দোলন করতে গিয়ে তিন-তিনটে ছেলের প্রাণ গেছে। গভর্নমেন্ট চাষিদের বোঝানোর অনেক চেষ্টা করছে, তোমরা উঠে যাও, যাঁরা মরেছে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেব। কিন্তু গ্রামবাসীদের জেদ, উর্দিধারীরা না-গেলে তাঁরা ওখান থেকে এক-পাও নড়বে না। সেই গ্রামের নাম সিলগার।

পয়লা ফেব্রুয়ারী বেলা ১২টায় রাজ রেস্তোরা থেকে তিনটি সাদা স্করপিও গাড়ি নিয়ে যাত্রা শুরু হল। পিছন-পিছন চলল দুই-তিনটি মোটর সাইকেল। আমাদের আসল যাত্রা শুরু এইবার। এইবার জঙ্গলে ঢুকবো। আমরা বাইরে থেকে গেছি ১৮ জন। আমাদের গাড়িতে কমল শুক্লা ছিল। আরও কয়েকজন স্থানীয় সাংবাদিক ছিল। গাড়িতে রাজবীর বলছিল, গাড়ি চিন্তাগুফা তক যাতা হ্যায়। উস্কে বাদ ত্রিশ কিমি পয়দল চলকে ওহ গাঁও আতি হ্যায়। আমরা দেখব কোথায় বোমা পড়েছিল। গ্রামবাসীদের কাছে জানব, সত্যিসত্যিই কতজন মারা পড়েছে। কতজনের চোট লেগেছে।

আমাদের কোনও লুকোছাপা নেই। আমরা প্রথমে যাচ্ছি, জেলাশাসকের কাছে। পুলিশ সুপারের সঙ্গেও দেখা করব। তাঁদের বলব আমরা ফ্যাক্টফাইন্ডিং করতে যাচ্ছি। সত্যি আকাশ থেকে বোমা ফেলেছে কী-না, দেখব! কালেক্টর অফিসে নেই। অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপারকে পাওয়া গেল। হাসি-খুশি মানুষ। কিন্তু আমরা জঙ্গলে ঢুকব শুনে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগলেন, না-না আপনাদের সেখানে যেতে দিতে পারি না। আপনারা মান্যগণ্য লোক। জঙ্গলে গিয়ে আপনাদের যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলে কী হবে?

বেলা দিদি, প্রফেসর লক্ষ্মণ, নারায়ণ রাও তাঁকে অনেক করে বোঝালেন, আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। আমরা নিজেদের দায়িত্বে যাব। শোনা যাচ্ছে, আকাশ থেকে বোম্বিং হয়েছে। আমরা গিয়ে দেখতে চাই সত্যিসত্যি কী হয়েছে! জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আপনাদের সব জানাব। যদি বোম্বিং হয়ে থাকে বা না-হয়ে থাকে তাও জানাব। ঘন্টাখানেক পরে সহকারী পুলিশ সুপার এমন ভাব করলেন যেন হাল ছেড়ে দিচ্ছেন। ঠিক আছে আপনারা যান। যদি রিক্স নিতে চান-তো নিন।

আমাদের গাড়িগুলো ফের চলতে শুরু করল। রাস্তার দু'পাশে জঙ্গল। পিচের রাস্তা নয়। পুরু কংক্রিট দিয়ে তৈরী। মাওবাদীরা সিকিউরিটি ফোর্সের পথে মাইন পেতে রাখে। এইজন্য বোধহয় কংক্রিটের রাস্তা। ভেবেছে এখানে মাইন পুঁততে পারবে না!

কিছুক্ষণ বাদে ঘ্যাচ করে গাড়ি থামল। পুলিশ রাস্তা আটকেছে! গাড়ি থেকে নেমে দেখি বিরাট হট্টগোল। রাস্তার উপর সার দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সিআরপি'র ক্যাম্প। এখান থেকে বেরিয়ে এসেছে জওয়ানরা। তাঁদের হাতে বড় বড় বন্দুক। মেটাল ডিক্টেটর। চারদিক শুঁকছে কুকুর। উর্দিধারীরা আমাদের গাড়িও চেক করল। গাড়ির ডিকি খুলে দেখল। এদিক-সেদিক মেটাল ডিক্টেটর ছুঁইয়ে দেখল। আধার কার্ড দেখান। ভোটার কার্ড দেখান। শেষে বলল, যাইয়ে। সব মিলিয়ে প্রায় আধ ঘন্টার ব্যাপার।

আমরা ভেবেছিলাম, দোরানপাল থেকে বুরকাপাল গভীর জঙ্গলে ঢুকব। প্রথম যেখানে গাড়ি আটকে তল্লাশী হচ্ছিল সেখান থেকে কিছুটা দূরে গেলে দোরানপাল। দান্তেওয়াড় জেলায় অবস্থিত। একদফা তল্লাশির পরে গাড়ি সবে ছেড়েছে এমন সময় ফের বাধা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিআরপি। হাত দেখিয়ে বলছে, গাড়ি থামাও। আর একদফা চেকিং। কারবাইন, মেটাল ডিক্টেটর, স্নিফার ডগ। আবার আধার, আবার ভোটার কার্ড! এরপর তিন-চার কিমি অন্তর চেকিং। প্রতিটি জায়গায় আধ ঘন্টা করে দেরি। আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল, এসব সহকারী পুলিশ সুপারের কারসাজি নয়-তো!

ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছে। জঙ্গলের পথে যে কোনও সময়ে ঝুপ করে অন্ধকার নামবে। এখনও হয়তো চেষ্টা করলে বোমা ফেলার জায়গায় পৌছানো যায়। আমরা দোরানপাল পেরিয়ে গেলাম। গাড়ি জোরে ছুটছে। সবে তিন-চার কিমি গেছে, এমন সময় ফের বাধা। নতুন করে চেকিং! শুক্লা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিল। ক্ষেপে গিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। একজন পুলিশ তাঁর কাছে আধার কার্ড দেখতে চাইছিল। সে বলল, নেহি দেখাইঙ্গে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে আধার কার্ড দেখানোর দরকার নেই।

পুলিশও খুব চেঁচামেচি করতে লাগল। সরকারি কাজে বাধা দিচ্ছেন! এ-তো ক্রাইম আপনাদের গোটা দলকে অ্যারেস্ট করতে পারি জানেন। শুক্লাও ছাড়ার পাত্র নয়। ক্রমে সে ঠান্ডা হয়ে এলো। কিন্তু পুলিশ তখনও গরম দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যে ভটভটিতে চেপে পুলিশের একজন বড় অফিসার এসে হজির হলেন। ''আমার সাব-অর্ডিনেটরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার! আমি মানব না, আপনাদের যেতে দেব না।''

অফিসারকে অনেকে মিলে বোঝাল, আমাদের যেতে দিন আর এরকম হবে না। বেলাদিদিও কত করে বললেন। শেষ পর্যন্ত শুক্লা বলল, হামারা গলতি হো গ্যয়া। অফিসার বেলাদিদিকে বলল, ম্যাডাম আপনার নাম শুনেছি। সরি, আপনাদের যেতে দিতে পারছি না। সেদিন আর যাওয়া হ'ল না।

আমরা দোরানপাল অবধি পিছিয়ে এলাম। সে জায়গাটা গঞ্জের মত জায়গা। অনেক দোকান-পাট। কয়েকটা খাবারের দোকানও ছিল। ভেবেছিলাম কিছু কিনে খাব। কিন্তু পুলিশ চাইছিল, আমরা রাতে না-খেয়ে থাকি। আমরা দেখলাম, যতগুলি দোকান আছে পুলিশ বন্ধ করে দিচ্ছে। দোকানে লাঠি ঠুকে ঠুকে বলছে। বনধ করো, বনধ করো। দোকান থেকে যে খাবার কিনে খাব, তার আর উপায় রইলো না। দোরানপাল থেকে সুকমার দিকে তিন-চার কিমি পিছিয়ে গেলে দুব্বাটোটা গ্রাম। সেখানে পঞ্চায়েত অফিসে বেলাদিদির জানাশোনা। সেখানে আমাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু পুলিশ আমাদের থাকতে দিল না। বড় রাস্তার ধারে একটি যাত্রী প্রতিক্ষালয় ছিল, তার পাশে একটি পরিত্যক্ত চালাঘরে থাকার ব্যবস্থা হ'ল। সিআরপি সেখান থেকেও উৎখাত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

পরদিন সকালে ফের যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ফের পুলিশ ঝামেলা শুরু করল। আর যাওয়া হ'ল না। বেলাদিদি সেই রাস্তার উপরেই প্রেস কনফারেন্স করলেন।

হামকো দুব্বোটোটা গাও পর রোক দিয়া হ্যায়। এরিয়াল স্ট্রাইক হুয়ে হ্যায়! ম্যাগর ইঁহা কে যো গভর্নমেন্ট হ্যায়, ওহ বোল রহা হ্যায় অ্যায়সা কুছ নেহি হুয়া। আকাশপথে হামলা হয়েছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট বলছে, এরকম কিছু হয়নি। নিহত এক মহিলার ছবিও দেখা গেছে। আমাদের টিম ওই গ্রামে যেতে চেয়ে ছিল। আমরা গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করতাম, কীভাবে এয়ার স্ট্রাইক হ'ল।

৪ফেব্রুয়ারী,'২৩ বাড়ি পৌঁছলাম। বাড়ি ফিরে শরীর খারাপ হ'ল। মনটাও খারাপ ছিল। ভেবেছিলাম, গভীর জঙ্গলে গিয়ে দেখব কী হয়েছে, কিন্তু যাওয়া হ'ল না। আর কী যাওয়া হবে! আমরা অবশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। যেখানে যাওয়ার ছিল সেখানে যেতে পারিনি বটে কিন্তু একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে গেছে, সত্যিই আকাশ থেকে বোমা ফেলেছিল। সেইজন্য অত ঢাক-ঢাক, গুড় গুড়। বাইরের লোকের যেতে মানা। যদি কিছুই না-হত, তাহলে নিজেরাই বলত, যাও, দেখে এসো আমরা কিছু করিনি।

মাঝে একদিন বেলাদিদি ফোন করেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কি দণ্ডকারণ্যে ফ্যাক্টফাইন্ডিং করা যাবে না? তিনি বললেন, কেন যাবে না? আমরা শিগ্‌গিরি যাবো, এবার অন্য স্ট্র্যাটিজি নিচ্ছি।